আত্ম-উন্নয়ন

বিদ্যুৎ মিত্র

আত্ম-উন্নয়ন

বিদ্যুৎ মিত্র

প্রজাপতি প্রকাশন

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব: লেখকের
প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ১৯৯২
দ্বিতীয় সংস্করণ
নভেম্বর, ১৯৯৪
প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
(সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান)
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SELF-IMPROVEMENT
By: Biddyut Mitra
ISBN-984-462-903-9
মূল্য: বাহান্ন টাকা

বিদ্যুৎ মিত্রের

আরও ক'টি আত্মোন্নয়নমূলক বইঃ

নিজেকে জানো

জনপ্রিয়তা

সুখ-সমৃদ্ধি

আত্মসম্মোহন

ধূমপান ত্যাগে আত্মসম্মোহন

যৌন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান

সঠিক নিয়মে লেখাপড়া

খালিহাতে আত্মরক্ষা

ব্যায়াম

ভূমিকা

আত্ম-উন্নয়ন করতে হলে নিজের মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে আপনার। আর সেটা করতে হলে জানতে হবে মনটা কি, কতটা এর ক্ষমতা। মোটামুটিভাবে সবাই জানি মনের অনেক ক্ষমতা। তার অনেক প্রমাণও পেয়েছি আমরা বেশিরভাগ মানুষ। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ অনেক এগিয়ে গেলেও আসলে মন নিয়ে গবেষণা তেমন হয়নি বললেই চলে।

আমরা শুনেছি, অনেক দেখেওছি, এখানে বসে চোখ বুজে আউলিয়া-দরবেশ ঠিক ঠিক বলে দিচ্ছেন বহুদূরে এই সময়ে কি ঘটছে; বলে দিচ্ছেন কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এসে হাজির হবে এমন একজন যাকে কেউ আশা করছে না; বলে দিচ্ছেন অমুক জায়গায় গিয়ে অমুকের স্যুটকেস খুলে দেখো তোমার হারানো জিনিস রয়েছে ওর মধ্যে। শুধু বলে দেয়াই নয়, এখানে বসে তিনি সারিয়ে দিচ্ছেন দূরের কারও রোগ-বালাই। সত্যিই সে ভালো হয়ে উঠছে।

এসব কি করে করছেন তিনি? অলৌকিক কোনো ক্ষমতার বলে? নাকি স্রেফ আন্দাজ, বা ঝড়ে বক? যা-ই হোক, একটা ব্যাপার মানতেই হবে, ক্ষমতাটা জাগতিক হোক বা ঐশ্বরিক হোক, ব্যাপারগুলো ঘটছে, এবং এসব ঘটাচ্ছেন তিনি তাঁর মনের সাহায্যে।

এই ক্ষমতাটা অর্জন করতে পারলে কেমন হয়? চমৎকার হয় না? কথাটা যে হালকাভাবে বলছি না, সেটা বোঝাবার জন্যে নিজের জীবন থেকে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করছি।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছি, শেষ পরীক্ষার দিন হঠাৎ সকাল থেকে শুরু হলো ভয়ানক জ্বর। ম্যালেরিয়া। বাড়তে বাড়তে বেলা সাড়ে নটা নাগাদ জ্বর গিয়ে ঠেকলো একশো পাঁচ ডিগ্রিতে। আধঘন্টা পর পরীক্ষা, অথচ দুটো লেপ দিয়েও চেপে ধরে রাখা যাচ্ছে না আমাকে, এমন হি-হি কাঁপুনি। সেইসাথে প্রলাপ বকছি সমানে। আমাদের প্রতিবেশী ডাক্তার জোহরা বেগম কাজীকে ডেকে আনা হলো। দেখেশুনে তিনি নির্দেশ জারি করলেন, পরীক্ষা দেয়ার তো প্রশ্নই উঠতে পারে না, এইরকম শারীরিক অবস্থায় মানসিক চাপ পড়লে মাথাটাই খারাপ হয়ে যেতে পারে—কাজেই পরীক্ষা বন্ধ।

মা তো মহাচিন্তায় পড়লেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো, আমার এক বন্ধু বাবু (প্রয়াত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী জাহিদুর রহিম)-এর নানা এখন ঢাকায়। জানা আছে, তিনি দরবেশ মানুষ, ঝাড়ফুঁক জানেন। সাথে সাথেই খবর দেয়া হলো তাঁকে। বাবুদের বাড়ি পঞ্চাশ

গজের মধ্যেই, খবর পেয়ে চলে এলেন নানা। নূরানী চেহারা, পাকা দাড়ি, মুখে সদা মিষ্টি হাসি।

অত জ্বরের মধ্যেও কিন্তু হুঁশ আছে আমার। প্রবল আপত্তি জানালাম—ওসব বুজরুকি আমি বিশ্বাস করি না, ঝাড়ফুঁক লাগবে না আমার, ওসবে কোনো কাজ হবে না। অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন মা, অনেক করে বোঝালেন ফুঁকে কাজ যদি না হয় কোনো ক্ষতি হচ্ছে না আমার; কিন্তু যদি কাজ হয়, পরীক্ষাটা দিতে পারছি, পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে না বন্ধুদের থেকে। অগত্যা নিমরাজি হলাম, যেন নেহায়েত দয়া পরবশ হয়েই।

মাথার কাছে বসে কিছু দোয়া-দরুদ পড়লেন নানা, তারপর তিনটে ফুঁ দিয়েই উঠে পড়লেন। একটি কথাও না বলে চলে গেলেন ঘর ছেড়ে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে উঠে বসলাম বিছানায়। কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেছে, নেমে গেছে গায়ের জ্বর, পরীক্ষার হল পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে একেবারে নরমাল। পরীক্ষা দিলাম, এবং পাসও করলাম, প্রথম বিভাগে।

কী মনে হয় এ থেকে? অনেক প্রশ্ন এসে ভিড় করে না? অলৌকিক শক্তি বলে কি সত্যিই কিছু আছে? এটা কি সম্মোহনের মাধ্যমে একজনের ওপর আরেকজনের মনের প্রভাব? নাকি এক্সট্রা সেনসরি প্রজেকশন? এসব যদি সত্যি হয় তাহলে কি পরকাল, স্বর্গ-নরক, সেসবও সত্যি? নাকি এটা সম্পূর্ণ জাগতিক বাস্তব কোনো শক্তি—সাধনার ফলে কিংবা দৈবাৎ কেউ কেউ জেনে যায় এর প্রয়োগ-কৌশল?

আগেই বলেছি, মানুষের মন নিয়ে গবেষণা হয়েছে বড্ডো কম। শুধু মানুষ কেন, পশুপক্ষী, গাছপালা সবারই মন আছে; তবে এ নিয়ে নাড়াচাড়া হয়নি তেমন; যদিও আমরা সবাই জানি, এরা ইচ্ছে ও প্রয়োজন মতো নিজেদের আকৃতি রঙ ও গঠন পরিবর্তন করে নিয়েছে হাজার হাজার বছরের চেষ্টায়। শুষ্ক মরুভূমির গাছ পানি ধরে রাখার জন্যে মোটা করে নিয়েছে গায়ের চামড়া, খসিয়ে দিয়েছে পাতার বাহার; ছাগলে মুড়ায় বলে গোলাপ গাছ নিয়েছে কাঁটা; লুকোবার প্রয়োজনেই প্রজাপতির বিচিত্র রঙিন পাখা, বহুরূপী গিরগিটির রঙ পরিবর্তন। মানুষের মন এদের থেকে অনেক উন্নত, অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে—এতোই শক্তিশালী।

মানুষের মনের ভাব, বোধ, চিন্তা, স্মৃতি, ইচ্ছা, স্বপ্ন, কল্পনা ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করে ফেললেন মেক্সিকোর এক স্বল্পশিক্ষিত রেডিও মেকানিক হোসে সিলভা (JOSE SILVA)। হঠাৎ করে তিনি বুঝে ফেললেন মনের কোন্ শক্তিটাকে কিভাবে ব্যবহার করে অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করেন আউলিয়া-দরবেশ-সাধু-সন্ন্যাসীরা। কিছুদিন চর্চা করেই তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, এজন্যে বিশেষ কোনো গুণের অধিকারী হওয়ার দরকার নেই, বিশ-ত্রিশ বছর বনে-জঙ্গলে-পাহাড়ে সাধনারও দরকার নেই—যে-কোনো সাধারণ মানুষ একটু ধৈর্য ধরে চর্চা করলে দু'তিন মাসেই আয়ত্ত করতে পারবে এ-বিদ্যা।

হোসে সিলভা একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এর পর। পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষকে ট্রেনিং দিয়েছেন অর্থের বিনিময়ে। সেই অর্থ ব্যয় হচ্ছে আরও ব্যাপক

গবেষণার কাজে।

সিলভার দেখাদেখি উন্নত বিশ্বের চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে এরপর। অনেক বিজ্ঞানী ঝাঁপিয়ে পড়েছেন গবেষণার কাজে, নানান ধরনের আশ্চর্য ফলাফল বেরিয়ে আসছে একের পর এক। বেরিয়ে আসছে সহজতর পদ্ধতি। এই বইয়ের মাধ্যমে আমরা এসব পদ্ধতি শেখাবো পাঠককে, কিভাবে কি চর্চা করলে নিজেই এসব ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায় শিখিয়ে দেবো একে একে। যে-কোনো ধর্মের মানুষ, বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী, সবাই চর্চা করতে পারেন; এর মধ্যে কারও ধর্ম বা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি কথাও নেই।

শিখবেন?

আগামী পরিচ্ছেদ থেকেই শুরু হয়ে যাবে কাজের কথা। কিন্তু তার আগে একটা কথা জানিয়ে রাখিঃ মোটেও হালকা ভাবে নেবেন না এ-বইটিকে—নিঃসন্দেহে ধরে নিন, আজ পর্যন্ত জীবনে আপনি যতো বই পড়েছেন, এটি হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই। কোনো সন্দেহ নেই, এ-বই পড়ে শেষ করার পর আপনার জীবনের মোড়ই ঘুরে যাবে, আপনি আর আগের সেই মানুষটি থাকবেন না। থাকতে পারবেন না। কারণ, আত্ম-উন্নয়নের এমন সুযোগ হাতে পেয়ে ছেড়ে দেয় কোন্ বোকা! উন্নতি আপনাকে করতেই হবে।

ভূমিকা শেষ করার আগে একটু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নেয়া যাক। এ বইটি লেখা সম্ভব হয়েছে আমার পি. এইচ. ডি. শ্যালিকা ড. নাজমা ইয়াসমিন হক ও তাঁর স্বামী ড. ফজলুল হকের নিঃস্বার্থ, সহৃদয়, সক্রিয় সহযোগিতায়। এঁরা দু'জন হোসে সিলভার চারদিনের 'মাইণ্ড কন্ট্রোল' ট্রেনিং কোর্স সম্পূর্ণ করেছেন মালয়েশিয়ায়, এদেশী মুদ্রামানে এগারো হাজার টাকার বিনিময়ে। এ-বই রচনার কাজে পদে পদে সাহায্য পেয়েছি আমি এঁদের কাছে, নিজেদের অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন এঁরা আমার সাথে সুদীর্ঘ আলোচনায়, বইপত্র পড়তে দিয়েছেন যখন যা চেয়েছি। এঁরা চেয়েছেন এদেশের মানুষকে এ-বিদ্যা শিখে কাজে লাগাবার সুযোগ করে দিতে।

বাঙালী পাঠক যদি এ-বই থেকে উপকৃত হতে পারেন, আমাদের সবার পরিশ্রম সার্থক হবে।

এক

মন নিয়ন্ত্রণ

অনেক ভাবেই মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। তার একটি হলো সম্মোহন। সম্মোহনের সাহায্যে নিজেকে প্রভাবিত করে অটো সাজেশনের মাধ্যমে অনেক উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু সম্মোহিত অবস্থায় কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব এসে যায় বলে স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কল্পনার ক্ষমতা অনেকখানি লোপ পায়। অথচ নতুন এই পদ্ধতিতে কল্পনাকে ব্যবহার করতে হবে আপনার নিজের প্রয়োজনে। সেইজন্যে সম্মোহনের কাছাকাছি আর একটি স্তর আবিষ্কার করা হয়েছে, যেখানে পৌঁছে স্থিত হবে মানুষ, কিন্তু তার প্রখর কল্পনাশক্তি যথেচ্ছ ব্যবহারে কোনো বাধা থাকবে না।

আমরা জানি, আমাদের ব্রেন ইলেকট্রিসিটি তৈরি করে। এই বিদ্যুতের সাইকেলকে বৈজ্ঞানিকেরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নাম দিয়েছেন বিটা, আলফা, থিটা ও ডেলটা রিদ্‌ম্‌। যাঁরা ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কে ধারণা রাখেন তাঁরা জানেন, সবচেয়ে ভালো সার্কিট সেটাই যার প্রতিরোধ-ক্ষমতা (resistance) সবচেয়ে কম; কারণ ওই সার্কিটই নিজের বৈদ্যুতিক শক্তিকে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগাতে পারে। মস্তিষ্কের ব্যাপারেও কথাটা সত্যি। ব্রেনটা যখন সবচেয়ে কম তৎপর থাকে তখন তার ক্ষমতা থাকে সবচেয়ে বেশি। কম ফ্রিকোয়েন্সিতে অনেক বেশি তথ্য সংগ্রহ ও জমা করে রাখতে পারে ব্রেন।

ধ্যানের মাধ্যমে ইচ্ছেমতো বিটা লেভেল থেকে আলফা, থিটা ও ডেলটা লেভেলে ওঠানামা করতে শিখে নিয়েছেন সাধু-সন্ন্যাসীরা। সম্মোহন-জাতীয় পদ্ধতিতে শারীরিক ও মানসিক শিথিলতা সৃষ্টি করছেন তাঁরা, সেইসাথে, মানসচক্ষে পরিষ্কার ছবি ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা, অর্থাৎ কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটাচ্ছেন নিজের মধ্যে সচেতনভাবে।

আমরাও যদি এই ধ্যান করাটা শিখে নিতে পারি তাহলে তাঁদের মতোই ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই ক্ষমতা আমরা কে কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবো সেটা যার যার নিজস্ব ব্যাপার। সমস্ত সম্ভাবনাই তুলে ধরা হবে আপনার সামনে।

বইটা একবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলুন। প্রথমবার পড়বার সময় কোনো অনুশীলনই চর্চা কবতে যাবেন না। একবার সবটা পড়ে নিয়ে তারপর এক এক

করে চর্চা শুরু করুন প্রথম থেকে। আগেরটা ভালোমতো রপ্ত না করে পরের অনুশীলনে যাবেন না।

সবগুলো পরিচ্ছেদ শেষ করবার পর আপনি আবিষ্কার করবেন, সম্পূর্ণ নতুন এক জগতে প্রবেশ করেছেন আপনি, সম্ভব-অসম্ভবের বেড়া আর ততোটা কঠিন মনে হচ্ছে না, আশ্চর্য এক বিদ্যা চলে এসেছে হাতের মুঠোয়, নিজের ভেতর অনুভব করছেন এক অসাধারণ ক্ষমতা।

বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে। কারণ পদ্ধতিটা এমনই যে এটা কারও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধার ধারে না। যেভাবে যা করতে বলা হবে করুন, নাহয় অবিশ্বাস নিয়েই করুন, যখন নিজের ভেতর ক্ষমতা অনুভব করবেন স্পষ্টভাবে, যখন বিদ্যাটা কাজে লাগিয়ে ফল পেতে শুরু করবেন, তখন আপনিই আসবে বিশ্বাস, সাধতে হবে না।

অনুশীলন শুরু করবার আগে লেভেল সম্পর্কে দু'একটি কথা।

আজকাল আলফা সম্পর্কে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। এটা ব্রেন ওয়েভের একটা প্যাটার্ন। ইলেকট্রোএনকেফ্যালোগ্রাফের **(Electroencephalograph)** সাহায্যে মাপ-জোখ করে স্পন্দনের সাইকেল অনুযায়ী ব্রেন-ওয়েভকে ভাগ করা হয়েছে চারটি লেভেলে। প্রতি সেকেণ্ডে কম্পন যদি চোদ্দ বা তারচেয়ে বেশিবার হয় তাহলে তাকে বলা হয় বিটা ওয়েভ। সেকেণ্ডে সাত থেকে চোদ্দবার হলে আলফা, চার থেকে সাত হলে থিটা, এবং চারের নিচে হলে ডেলটা ওয়েভ।

আপনি যখন সম্পূর্ণ জেগে রয়েছেন, দুনিয়াদারির কাজে রত, সচেতন, তখন আপনি বিটা লেভেলে রয়েছেন। যখন আপনি দিবাস্বপ্ন দেখছেন বা ঘুমিয়ে পড়তে যাচ্ছেন, কিন্তু এখনো পুরোপুরি ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করেননি; কিংবা ঘুম ভাঙতে যাচ্ছে কিন্তু এখনো পুরোপুরি ভাঙেনি; তখন আপনি আলফা লেভেলে রয়েছেন। যখন ঘুমিয়ে পড়লেন, তখন আপনি আলফা থেকে নেমে থিটা লেভেলে এমনকি কখনও কখনও ডেলটা লেভেলে চলে যাচ্ছেন।

থিটা ও ডেলটা লেভেল নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করবো না আমরা। প্রথম দিকে অনুশীলনগুলোর মাধ্যমে আমরা আপনাকে শেখাবো কিভাবে ইচ্ছে করলেই সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন অবস্থায় যে-কোনো সময়ে আলফা লেভেলে চলে যেতে পারবেন আপনি। এতেই দেখবেন আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। থিটা বা ডেলটা লেভেলে যদি সচেতনভাবে পৌঁছতে পারেন তাহলে একজন মানুষের ক্ষমতার সম্ভাব্য চূড়ান্ত পর্যায়ে উপস্থিত হবেন। এ সম্পর্কে বইয়ের শেষদিকে কিছু পথ নির্দেশ থাকবে।

এবার কাজে নেমে পড়া যাক। কেমন?

দুই

ধ্যান কি করে করতে হয়

প্রথমেই আপনি শিখতে যাচ্ছেন কিভাবে ধ্যান করতে হয়। এটা যখন শেখা হয়ে যাবে, মনের এমন একটা লেভেলে পৌঁছুবেন আপনি, যেখানে পৌঁছে সমস্যা সমাধানের জন্যে মুক্ত করে দিতে পারবেন আপনার কল্পনা-শক্তিকে। প্রথমে আপনি ধ্যান করা শিখবেন, সমস্যা সমাধান করতে শিখবেন পরে।

হোসে সিলভার চারদিনের ট্রেনিং কোর্সে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এসব শেখাবার জন্যে অভিজ্ঞ লেকচারার থাকেন, কিন্তু বই পড়ে শেখার সময় আপনি কোনো গাইড পাচ্ছেন না। তাই এই পদ্ধতিটা চারদিনের মধ্যে শিখতে পারবেন না, শিখবেন একটু দেরিতে। তবে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, কাজেই শিখতে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না।

আপনি শুধু যদি ধ্যান করা শেখেন, এবং তারপর আর সামনে না বাড়েন, তাহলেও কিন্তু এক ধরনের সমস্যার সমাধান আপনা থেকেই হতে থাকবে। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অদ্ভুত সুন্দর একটা ব্যাপার ঘটে, সেটাকে আমরা সুখপ্রদ প্রশান্তি বলতে পারি। যতো বেশি ধ্যানমগ্ন হবেন, নিজের ভেতর যতো গভীরে ডুবে যাবেন, ততোই ওই সুখপ্রদ প্রশান্তি আর পরমানন্দের একটা অনুভূতি আপনার সমগ্র অস্তিত্বে এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে জীবনের কোনো সংকটই সেটাকে নষ্ট করতে পারবে না।

আপনার শরীরও তাতে উপকৃত হবে। প্রথমে আপনি উপলব্ধি করবেন, ধ্যানমগ্ন অবস্থায় উদ্বেগ আর অপরাধবোধ একেবারেই থাকছে না। ধ্যান করে আলফা লেভেলে পৌঁছুবার ভালো দিকগুলোর একটা হলো, চেষ্টা করেও নিজের ভেতর আপনি রাগ বা অপরাধবোধ আনতে পারবেন না। হঠাৎ কোনোভাবে এই সব বোধ যদি অনুপ্রবেশ করেও, সাথে সাথে আলফা থেকে বিটা লেভেলে অর্থাৎ ধ্যানমগ্ন অবস্থা থেকে জাগ্রত অবস্থায় উঠে আসবেন আপনি। তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। চর্চা করতে থাকুন, ধীরে ধীরে ধ্যানমগ্ন অবস্থার মেয়াদ বাড়তে থাকবে। প্রথমবার যতোক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকবেন, দ্বিতীয়বার তারচেয়ে একটু বেশিক্ষণ থাকবেন, এই ভাবে এক সময় রাগ বা অপরাধ বোধের হামলা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে, ফলে ধ্যানও আর আপনি না চাইলে ভাঙবে না।

এই বোধগুলো উপস্থিত না থাকার অর্থ হলো, মনের যে-সব ক্ষতিকর আচরণ বা

তৎপরতা শরীরকে অসুস্থ ও দুর্বল করে তোলে, ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সেগুলো নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। শরীরের ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে ওটাকে সুস্থ রাখার জন্যে। তার নিজেরই রয়েছে নিরাময় ও উপশম ব্যবস্থা। মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মনই সে ব্যবস্থা বানচাল করে দেয়। তাই মনকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর মনকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রথম পদক্ষেপ হলো ধ্যান। একক ভাবে শুধু ধ্যানই তার নিজস্ব গতিপথ ধরে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যায়, যাবার পথে শরীরের নিরাময় এবং উপশম ব্যবস্থাকে পুনর্বাসিত করে। একদা উত্তেজনা আর উদ্বেগের কারণে যে শক্তি ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় ব্যবস্থাটি অচল হয়ে পড়েছিল, সেই শক্তি ফিরে পাওয়ায় আবার সেটা পুরোদমে কাজ শুরু করে।

এবার জেনে নিন আলফা লেভেলে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পৌঁছুতে হলে কি করতে হবে।

সকালে আপনার ঘুম ভাঙলো। বাথরুমে যাবার তাগাদা থাকলে যান, তারপর আবার ফিরে আসুন বিছানায়। পনেরো মিনিট সময় বেঁধে নিন অ্যালার্ম ক্লকে, যাতে অনুশীলন করবার সময় ঘুম এসে পড়লেও সেটা সময়মতো ভেঙে যায়। চোখ বন্ধ করে বন্ধ পাতার ভেতর দিয়ে ওপর দিকে তাকান, বিশ ডিগ্রি উঁচুতে। কারণটা এখনো পরিষ্কার জানা সম্ভব হয়নি, তবে দেখা গেছে, চোখের এই পজিশনই আলফা সৃষ্টির জন্যে সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

এবার, ধীরে ধীরে, প্রতিবার দু'সেকেণ্ড করে বিরতি নিয়ে, একশো থেকে নিচের দিকে গুণতে থাকুন, এক পর্যন্ত। একশো, নিরানব্বই, আটানব্বই, সাতানব্বই... এইভাবে। যখন গুণবেন, সম্পূর্ণ মনোযোগ এই কাজের ওপর স্থির রাখুন। আশা করা যায় প্রথমবার গোণা শেষ করলেই আপনি আলফা লেভেলে পৌঁছে যাবেন।

আলফাতে প্রথমবার পৌঁছে এক-একজনের এক-এক রকম অভিজ্ঞতা হয়। কারো মনে হয়, 'আহ্, কি আরাম!' কেউ আবার এতো গভীর প্রশান্তি অনুভব করে যে তার মনে হয়, 'আরে, কোনো অনুভূতিই নেই আমার!' আবার কেউ কেউ জেগে থাকা অবস্থার সাথে এই অবস্থার তেমন কোনো পার্থক্যই অনুভব করতে পারে না। এর কারণ হলো, আলফা লেভেল আমাদের জন্যে নতুন কোনো ব্যাপার নয়, এর সাথে আমরা সবাই পরিচিত—কেউ বেশি কেউ কম।

সকালে যখন আমাদের ঘুম ভাঙে, তখন প্রায়ই আমরা আলফা লেভেলে কিছুক্ষণের জন্যে থাকি। থিটা থেকে, অর্থাৎ ঘুমের লেভেল থেকে বিটায়, অর্থাৎ জেগে থাকা লেভেলে আসার সময় আলফা লেভেল আমাদেরকে পেরোতেই হয়। পেরোবার সময় ওই লেভেলে একটু দেরি করি আমরা, প্রায় প্রতিদিন সকালেই।

প্রথমবার অনুশীলনের সময় আপনি যদি কিছুই অনুভব না করেন, বুঝতে হবে এর আগে আলফা লেভেলে অনেকবার গেছেন আপনি, কিন্তু টের পাননি। মনটাকে শান্ত করুন, ঘাবড়াবেন না। অনুশীলন চালিয়ে যান।

একাগ্র মনোযোগের সাথে চেষ্টা করলে যদিও আপনি প্রথমবারই আলফা লেভেলে পৌঁছে যাবেন, তবু আলফা লেভেলের নিচের দিকে এবং তারপর থিটা লেভেলে নামতে হলে আরো পঁচিশদিন আপনাকে চর্চা করতে হবে পদ্ধতিটি। একশো থেকে এক, এই কাউন্ট ডাউন পর পর পাঁচ দিন চালান। তারপর পঞ্চাশ থেকে এক, আরো পাঁচ দিন।

তারপর পঁচিশ থেকে এক, আরো পাঁচ দিন। তারপর দশ থেকে এক, পাঁচ দিন। সবশেষে পাঁচ থেকে এক, পাঁচ দিন।

প্রথমবার বা প্রথম কয়েকবার একাগ্র মনোযোগের সাথে চেষ্টা করার পরও যাঁরা আলফা লেভেলে পৌঁছুতে পারছেন না বলে মনে করছেন, এবার তাঁদের জন্যে কিছু নিয়ম। এই নিয়ম অন্যান্য সবাইও ইচ্ছে করলে ব্যবহার করতে পারেন, কোনো ক্ষতি তো নেই–ই, লাভের পরিমাণ ষোলো আনা। এই নিয়মকে আমরা তিন–এক (৩–১) পদ্ধতি নামে অভিহিত করতে পারি।

শরীর শিথিল করে দিয়ে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নেয়ার নিয়ম এটা। আপনারা যারা এখনো আলফা লেভেলে পৌঁছুতে পারছেন না বলে মনে করছেন, এই নিয়ম তাঁরা সকালেই চর্চা করবেন, বাকিরা সকাল, দুপুর, রাত বা যে–কোনো সময় চর্চা করতে পারেন।

পছন্দসই, প্রিয় একটা জায়গা বেছে নিন। শুয়ে পড়ুন বা আধশোয়া হোন, ভঙ্গিটি যেন অত্যন্ত আরামদায়ক হয়। জামা–কাপড় আঁটো না হয়ে ঢিলে–ঢালা হওয়া দরকার। নিরিবিলি, শান্ত, ঠাণ্ডা পরিবেশ হলে ভালো হয়। এবার আপনার শরীর সম্পূর্ণ ঢিল করে দিন, শিথিল করে ছেড়ে দিন নিজেকে। চোখ বন্ধ করুন। তারপর গভীর ভাবে, বুক ভরে শ্বাস গ্রহণ করুন। নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় মনে মনে ৩ সংখ্যাটি তিনবার উচ্চারণ করুন, সেই সাথে মনের চোখ দিয়ে ৩ সংখ্যাটির ছবি চাক্ষুষ করুন, এ–ও তিনবার।

আরেকটা গভীর শ্বাস নিন, এবং নিঃশ্বাস ফেলার সময় মনে মনে ২ সংখ্যাটি তিনবার উচ্চারণ এবং মনের চোখে সংখ্যাটি তিনবার চাক্ষুষ করুন।

আরেকটা গভীর শ্বাস নিন, নিঃশ্বাস ফেলার সময় মনে মনে ১ সংখ্যাটি তিনবার উচ্চারণ করুন, মনের চোখে সংখ্যাটি তিনবার চাক্ষুষ করুন।

এই নিয়ম চর্চা করার পর আপনি যেখানে পৌঁছুলেন সেটাকে আমরা বেসিক লেভেল বলতে পারি, এই বেসিক লেভেল থেকে অন্যান্য যে–কোনো লেভেলে নেমে যাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ।

বেসিক লেভেল থেকে আরো নিচের লেভেলে যেতে হলে বা বেসিক লেভেলেরই আরো গভীর তলদেশে যেতে হলে একশো থেকে এক, এই নিয়মে কাউন্ট ডাউন করবেন।

এবার অটোসাজেশন প্রসঙ্গ। এই অটোসাজেশন সবার জন্যে। প্রতিদিন অনুশীলন শেষে যে লেভেলেই পৌঁছান আপনি, সাজেশনগুলো দিতে পারবেন নিজেকে। যতো গভীর লেভেলে সাজেশন দেবেন ততোই বেশি উপকার পাবেন।

১। আমার মনের এই নতুন শক্তি মানব কল্যাণের সহায়ক হবে।

২। প্রতিদিন প্রতি কাজে আমি ভালো করছি, ভালো করছি, ভালো করছি। বা, প্রতিদিন সব দিক থেকে উন্নতি করছি।

৩। হ্যাঁ–সূচক ভাবনায় আমার মনের আশা পূরণ এবং উপকার হবে।

৪। মনের এই লেভেলে বা অন্য লেভেলে এবং জেগে থাকা অবস্থায় আমার মনের ওপর, আমার সমস্ত অনুভূতি এবং ইন্দ্রিয়ের ওপর, সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে আমার, এবং থাকবে।

প্রথমবার আলফা লেভেলে পৌঁছে প্রথমবারই এই লেভেল থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে নিজেকে অটোসাজেশন দেবেন আপনি। এই সাজেশন যতোবার ধ্যানমগ্ন হবেন ততোবার নিজেকে দিতে হবে। সব সময় একই সাজেশন ব্যবহার করা ভালো।

মনে মনে এই কথাগুলো বলুনঃ

'আমি এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুণতে যাচ্ছি; পাঁচ সংখ্যাটি উচ্চারণ করার সাথে সাথে আমি আমার চোখ খুলবো, সেই সাথে সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় জেগে উঠবো, অনুভব করবো সম্পূর্ণ সুস্থতা, শরীর-মন আগের চেয়ে ভালো লাগবে।'

এরপর আপনি গুণতে শুরু করুন। ১—২, ধ্যানমগ্ন অবস্থা থেকে উঠে আসতে শুরু করেছেন। ৩—এবার আবার নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিন যে পাঁচ পর্যন্ত গুণে আপনি আপনার চোখ খুলবেন, সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় জেগে উঠবেন, শরীর-মন তাজা আর ঝরঝরে লাগবে, কোনো রকম অসুস্থ বোধ করবেন না, বরং আগের চেয়ে সুস্থ বোধ করবেন। ৪—৫। পাঁচ পর্যন্ত গুণে, চোখ খুলুন। তারপর বলুন—'সম্পূর্ণ জেগেছি আমি, সুস্থ বোধ করছি।'

মোট পঁচিশ দিন সকালে চর্চা করার জন্যে অনুশীলন দেয়া হয়েছে আপনাকে। কিন্তু এই পঁচিশ দিন পেরোবার আগেই, মাত্র দশ দিন অনুশীলনগুলো চর্চা করার পর, নতুন আরেকটা কাজ ধরবেন আপনি। এবার দিনের যে-কোনো সময়, দুপুরে বা রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে আলফা লেভেলে পৌঁছুতে হবে আপনাকে। এর জন্যে দশ থেকে পনেরো মিনিট অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হবে। কারণ, আলফার হালকা লেভেল থেকে নয়, এবার আপনি বিটা থেকে গভীর আলফা লেভেলে নামতে চাইছেন, তাই সামান্য একটু অতিরিক্ত ট্রেনিং দরকার।

পছন্দসই, প্রিয় একটা জায়গা বেছে নিন। আরামদায়ক কোনো চেয়ারে বা বিছানার ওপর বসুন। নিচের দিকে পা ঝুলিয়ে বা পদ্মাসনেও বসতে পারেন। জামা-কাপড় ঢিলে-ঢালা হওয়া দরকার। নিরিবিলি, শান্ত, ঠাণ্ডা পরিবেশ হলে ভালো হয়। হাত দুটো শিথিল অবস্থায় ফেলে রাখুন কোলের ওপর। মাথাটা সিধে রাখুন, এদিক ওদিক যেন হেলে না পড়ে। এবার স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সচেতনতার সাথে ঢিল করার জন্যে প্রথমে শরীরের একটা অংশ তারপর আরেকটা অংশের ওপর গভীর মনোযোগ আরোপ করুন। শুরু করুন আপনার বাঁ পায়ের তলা থেকে, তারপর বাঁ পা, তারপর ডান পায়ের তলা—এইভাবে, যতোক্ষণ না আপনি গলা, মুখ, চোখ এবং সবশেষে খুলিতে না পৌঁছান। এটা প্রথমবার অনুশীলন করার সময় কি রকম শক্ত আর টান টান ছিলো আপনার শরীর উপলব্ধি করে অবাক হয়ে যাবেন আপনি।

এবার যে-কোনো একটা কিছুর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। যে কোনো জিনিস হলেই চলবে, সিলিঙের একটা দাগ বা দেয়ালের পেরেক—যা খুশি। নাক বরাবর তাকালে দৃষ্টিটা যেখানে পড়ে সেখান থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ওপরদিকে তাকাতে হবে আপনাকে। পেরেক বা দাগ যাই হোক, সেটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকুন, যতোক্ষণ না চোখের পাতা একটু ভারি ঠেকে, তারপর ওগুলোকে নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যেতে দিন। এবার পঞ্চাশ থেকে নিচের দিকে গুণতে গুণতে নামুন, এক পর্যন্ত।

এই রুটিন পাঁচ দিন মেনে চলুন। তারপর পঁচিশ থেকে এক পর্যন্ত, পাঁচ দিন। তারপর দশ থেকে এক পর্যন্ত, পাঁচ দিন। তারপর পাঁচ থেকে এক, পাঁচ দিন। এই পদ্ধতিতে ধ্যানমগ্ন হওয়ার চেষ্টা প্রতিদিন দু-তিনবার চালিয়ে যান, প্রতিবার দশ-পনেরো মিনিট ব্যয় করুন। নিজেকে সাজেশন দেয়ার কথা মনে আছে তো? এক্ষেত্রেও সেগুলো কাজে লাগাতে ভুলবেন না।

আলফায় পৌঁছুনো তো শিখে গেলেন, কিন্তু তারপর কি? ওখানে পৌঁছে নিজেকে সাজেশন দেয়া ছাড়া আর কি করবেন আপনি?

একেবারে শুরু থেকেই, ধ্যানমগ্ন অবস্থায় প্রথম যেবার পৌঁছুলেন তখন থেকেই, মানস-চোখে ছবি দেখা অভ্যেস করুন। মানস-চোখে ছবি দেখাটা যতো ভালো ভাবে শিখতে পারবেন আপনি, মনকে নিয়ন্ত্রণ করে সাফল্য অর্জন ততোই আপনার পক্ষে সহজ হয়ে উঠবে।

এ-ব্যাপারে প্রথম কাজ হলো, চাক্ষুষ করার জন্যে একটা উপকরণ তৈরি করা। উপকরণ মানে একটা স্ক্রীন, বা পর্দা। সাদা হলেই ভালো হয়, কারণ সাদার ওপরেই ছবি ফোটে ভালো। বড়সড় সিনেমার মতো পর্দা হওয়া উচিত, তবে আবার এতো বড় যেন না হয় যেটা মনের দৃষ্টির সবটুকু জুড়ে থাকে। পর্দাটাকে চোখের পাতার কাছাকাছি কল্পনা না করে কল্পনা করুন আপনার কাছ থেকে ছ'ফিট সামনে। মনোনিবেশের জন্যে যা আপনি নির্বাচন করবেন, সেটার ছবি এই পর্দায় দেখতে হবে আপনাকে। পরে এই পর্দা আরো অনেক কাজে ব্যবহার করা হবে।

মনে এই পর্দা তৈরি করা হয়ে গেলে, এবার ওটার গায়ে সাধারণ, পরিচিত কিছু একটা ছবি ফুটিয়ে তুলুন। সেটা একটা কলা হতে পারে, একটা আপেল বা কমলালেবু হতে পারে। প্রতিবার ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পৌঁছে এই ছবি ফুটিয়ে তুলবেন আপনি। একবার এটা, একবার ওটা না করে একটা জিনিসেরই ছবি দেখবেন, যদি বদলাতে চান তাহলে পরেরবার ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বদলাবেন। পর্দা সম্পর্কে একটা কথা। কারো কারো জন্য এটা তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তারা ইচ্ছে করলে চোখ বন্ধ করলে যা দেখতে পান সেটাকেই একটা পর্দা বলে মনে করতে পারেন।

যেনতেন ভাবে একটা ছবি ফুটিয়ে তুললে চলবে না। গভীর মনোযোগ আর আন্তরিকতার সাথে ওটাকে ফুটিয়ে তুলুন, যাতে আরো, আরো বাস্তব হয়ে ওঠে। ওটার যেন তিনটে দিকই পরিষ্কার দেখতে পান আপনি, রঙ এবং সমস্ত খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য সহ। শুধু ওটার কথাই ভাবুন।

মানুষের চিন্তাকে তুলনা করা হয় মাতাল বানরের সাথে। লাফ-ঝাঁপ দিয়ে এখান থেকে ওখানে চলে যাচ্ছে, মতিগতির কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। মাঝে মধ্যে আমাদের জন্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজ করলেও, এই ব্রেনের ওপর আমরা কতো কম নিয়ন্ত্রণ রাখি ভাবতে গেলে আশ্চর্য হতে হয়। এ বড় শক্তিশালী, এতোই শক্তিশালী যে একে নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারলে সমূহ বিপদ, শত্রুর মতো আচরণ করে বসবে।

শত্রু হলেও, ব্রেনের একটা স্বভাব হলো, কেউ যদি তাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে, তার একেবারে কেনা গোলাম বনে যায়। একবার যদি আমরা মনকে ট্রেনিং দিয়ে নিতে পারি, আমাদের জন্যে আশ্চর্য সব কাজ করে দিয়ে সে তাক লাগিয়ে দেবে। অপেক্ষা

করুন, একটু পরেই দেখতে পাবেন।

ইতিমধ্যে, সহজ সরল যে অনুশীলনগুলো চর্চা করার জন্যে দেয়া হলো, আপাততঃ তাই নিয়ে ধৈর্য ধরুন। একাগ্রতার সাথে মনটাকে ব্যবহার করে ব্রেনকে আলফা লেভেলে যাবার ট্রেনিং দিন। লেভেলে গিয়ে সাজেশন দিন নিজেকে। মনের পর্দায় ছবি ফুটিয়ে তোলার দক্ষতা অর্জন করুন। প্রথম দিকে নানা রকম বাজে চিন্তা নাক গলাবার চেষ্টা চালাবে, সেজন্যে অধৈর্য বা উত্তেজিত হবেন না। শান্ত ভাবে ওগুলোকে মন থেকে সরিয়ে ফেলুন, ফিরে আসুন নিজের কাজে। অস্বস্তি, বা উত্তেজনা বোধ করলে আপনার ধ্যান ভেঙে যাবে, উঠে আসবেন বিটা লেভেলে।

এই হলো ধ্যান, যা সারা দুনিয়ায় ব্যাপক ভাবে চর্চা করা হয়। আপনি যদি আর কিছু না, শুধু ধ্যান করেন, তাহলে উপভোগ করবেন, উইলিয়াম ওঅর্ডসওয়ার্থ যেটাকে বলেছেন, 'এ হ্যাপি স্টিলনেস অভ মাইণ্ড'। অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত গভীর এক শান্তিতে ছেয়ে যাবে। এরপর, ধ্যানের আরো যতো গভীরে প্রবেশ করবেন, ততোই আনন্দময় আর রোমাঞ্চকর হয়ে উঠবে আপনার অভিজ্ঞতা। রোজ তিনবেলা কোর্মা-পোলাও খেলে ওগুলোর স্বাদ যেমন আর আগের মতো পাওয়া যায় না তেমনি আপনার এই অভিজ্ঞতা থেকেও রোমাঞ্চের মাত্রা একটু একটু করে কমতে শুরু করবে। এটা ঘটবে এই অভিজ্ঞতায় আপনি অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন বলে, কি অনুভব করবেন তা আগে থেকে জানা থাকলে সেটা গভীর, গাঢ়ভাবে অনুভব করা যায় না। এই কাণ্ড ঘটতে শুরু করলে অনেকেই চর্চা করা ছেড়ে দেয়। কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে, ধ্যানমগ্নতা স্বয়ং একটা গন্তব্য নয়। আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যাত্রাপথে ওটা একটা পদক্ষেপ মাত্র। তাও, প্রথম পদক্ষেপ। কাজেই এক পা এগিয়ে হাল ছেড়ে দিলে মস্ত ভুল করবেন আপনি। অনেকে ছেড়ে দিক, আপনি ছাড়বেন না দয়া করে।

শুধু করার জন্যে ধ্যান করা, বা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কিছু ঘটার অপেক্ষায় থাকা, এ যথেষ্ট নয়। শুধু ধ্যানই আপনার মনে গভীর প্রশান্তি আনবে, সত্যি। তাতে আপনার শরীর-মন উপকৃত হবে, এ-ও সত্যি। কিন্তু ধ্যানের সাহায্যে আরো অনেক কিছু পাবার রয়েছে আপনার। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মনকে সচেতন করে তুলে সমস্যা সমাধানের কাজে ব্যবহার করা যায়। এর জন্যে আপনার কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। এখন বুঝতে পারছেন, মনের পর্দায় কমলালেবু বা অন্য কিছু ফুটিয়ে তোলার সহজ অনুশীলনটা কেন এতো গুরুত্বপূর্ণ?

আসুন, কাজ শুরু করা যাক।

ধ্যানমগ্ন হওয়ার আগে অর্থাৎ আপনার লেভেলে যাবার আগে ভাল লাগা একটা ঘটনার কথা চিন্তা করুন, যেটা আজ বা গতকাল ঘটেছে। অল্প সময় নিয়ে, দ্রুত, গোটা ঘটনাটা একবার স্মরণ করুন। তারপর নিজের লেভেলে যান। এবার তৈরি করা মনের পর্দায় ঘটনাটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটতে দেখুন। দৃশ্যগুলো পরিষ্কার চাক্ষুষ করুন, গন্ধ নিন, আওয়াজগুলো গভীর ভাবে শুনুন। ঘটনাটা ঘটার সময় আপনি যা অনুভব করেছিলেন, এখনও তাই অনুভব করুন। খুঁটিনাটি কিছুই যেন বাদ না পড়ে। ঘটনাটা আপনার বিটা স্মরণশক্তি যেভাবে স্মরণ করেছিলো আর আলফা যেভাবে স্মরণ করলো, দুটোর মধ্যে পার্থক্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবেন আপনি।

এর লাভটা কি? প্রথম লাভ, অনেক বড় কিছুর দিকে এটা আপনার প্রথম পদক্ষেপ। দুই, এই অনুশীলন থেকে সরাসরিও আপনি অনেক উপকার পাবেন। এবার দেখুন এটাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়। আপনার নিজের যে-কোনো একটা জিনিসের কথা ভাবুন, যেটা ঠিক হারিয়ে যায়নি, তবে খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগবে। গাড়ির চাবি হতে পারে। কোথায় আছে ওটা—দেরাজে, আপনার পকেটে, নাকি আপনার গাড়িতেই? সঠিক মনে করতে না পারলে, নিজের লেভেলে চলে যান, অতীতে ফিরে গিয়ে স্মরণ করুন শেষ কখন ওটা দেখেছেন। তারপর সেই মুহূর্তটিকে ভুলে গিয়ে, সময়ের সাথে সাথে এগিয়ে পরের ঘটনাগুলো এক এক করে স্মরণ করুন, জিনিসটা যেখানে রেখেছেন সেখানে এখনও যদি থাকে, পেয়ে যাবেন। (কিন্তু কেউ যদি জিনিসটা ওখান থেকে সরিয়ে ফেলে থাকে, সেটা অন্য ধরনের একটা সমস্যা। সমাধানের জন্যে আরো উন্নত টেকনিক দরকার।)

বেচারা ছাত্রটির কথা ভাবুন একবার, শিক্ষক তাকে বলেছেন, চলতি হপ্তার সোমবার দশটায় তার পরীক্ষা। চলতি হপ্তায়, নাকি আগামী হপ্তার সোমবারে? শতচেষ্টাতেও মনে করতে পারছে না ছাত্রটি। এই অবস্থায় আলফা লেভেলে পৌঁছে শিক্ষক ঠিক যা বলেছিলেন, সেটা মনে করতে পারবে সে।

এগুলো দৈনন্দিন জীবনের ছোটোখাটো সমস্যা, ধ্যান করে, সহজ সরল নিয়মের সাহায্যে সমাধান বের করে আনা যায়।

এবার বিরাট লাফ দিয়ে অনেক সামনে চলে যাবো আমরা। একটা ঘটনা, যেটা ঘটলে আপনি খুব খুশি হন, ঘটুক বলে কল্পনা করছেন, সেটার সাথে বাস্তব ঘটনার সংযোগ ঘটাবো আমরা, তারপর দেখবো কাল্পনিক ঘটনাটার কি অবস্থা হয়। পদ্ধতি-গুলো সহজ, শুধু যদি ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারেন, আপনার কাল্পনিক ঘটনা বাস্তব ঘটনা হয়ে উঠবে।

১নং বিধি।

ঘটনাটা ঘটবে, এই আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা আপনার থাকতে হবে। 'কাল সকালে রাস্তায় প্রথম যে লোকটার সাথে দেখা হবে, দেখবো নাক ঝাড়ছে সে,' এ-ধরনের ঘটনা এমনই তাৎপর্যহীন যে আপনার মন এটার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সম্ভবত আপনার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না। আপনার বস্ আগের চেয়ে ভালো ব্যবহার করবেন, অথবা নির্দিষ্ট একজন ক্রেতা আপনার পণ্যের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বোধ করবেন, সাধারণত করতে ভালো লাগে না এই ধরনের একটা কাজ এরপর করতে ভালো লাগবে-এগুলো সত্যি তাৎপর্যপূর্ণ এবং আকাঙ্ক্ষা করার মতো ব্যাপার।

২নং বিধি।

ঘটনাটা যে ঘটবে এ বিশ্বাস আপনার থাকতেই হবে। আপনি যা বিক্রি করতে চান সেটা যদি ক্রেতার কাছে প্রচুর পরিমাণে থেকে থাকে, ক্রেতা আপনার পণ্য কেনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে এ আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না। যুক্তি দিয়ে উপলব্ধি করে ঘটনাটা ঘটবে বলে যদি বিশ্বাস করতে না পারেন, আপনার মন এর বিরুদ্ধে কাজ করবে।

৩ নং বিধি।

ঘটনাটা ঘটবে, এই প্রতীক্ষায় থাকতে হবে আপনাকে। এটা একটা সক্ষ্ম বিধি.

এর গভীর অর্থ আছে। প্রথম দুটো বিধি সহজ এবং নিষ্ক্রিয়। এই তৃতীয়টির মধ্যে কিছুটা গতি আছে। একটা কিছুর আকাঙ্ক্ষা করা যায়, একটা ঘটনা ঘটবে বলে বাসনা করা যায়। বিশ্বাস করা যায় ঘটনাটা ঘটবে। কিন্তু তবু সেটা ঘটবে এই প্রতীক্ষায় বা প্রত্যাশায় নাও থাকতে পারেন। আপনি চান আপনার বস্ আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন, আপনি বিশ্বাস করেন ভালো ব্যবহার করা তার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু তবু ভালো ব্যবহার পাওয়ার প্রতীক্ষা করা থেকে এখনো অনেক দূরে রয়েছেন আপনি। এখানে প্রতীক্ষা করা মানে কোনো ঘটনা ঘটবেই বা কিছু পাবেনই বলে ধরে নেয়া হচ্ছে। ঠিক এই পর্যায়েই ধ্যান এবং মানস চোখে ছবি দেখার মতো শক্তিশালী মাধ্যমগুলোকে কজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৪ নং বিধি।

আপনি কোনো সমস্যা তৈরি করতে পারেন না। এটা একটা মৌলিক, সর্ব-নিয়ন্ত্রক বিধি। 'কি মজাই না হয় যদি আমার বস্‌কে বেকুব বানিয়ে এমন কিছু খারাপ কাজ তাকে দিয়েই করিয়ে নিতে পারি যাতে সবাই তাকে অযোগ্য বলে ধিক্কার দেয় আর চাকরি থেকে বরখাস্ত করে তার আসনে আমাকে বসায়!' আলফায় আপনি যখন সক্রিয় ভাবে কাজ করবেন, আপনার সংস্পর্শে হাইয়ার ইন্টেলিজেন্স থাকবে, এবং হাইয়ার ইন্টেলিজেন্সের দৃষ্টিতে এই ব্যাপারটা কোনোমতেই মজার বলে মনে হবে না। আপনি আপনার বস্‌কে ফাঁদে ফেলে তার চাকরি খেতে পারেন, কিন্তু তখন আপনি সম্পূর্ণ একা থাকবেন—এবং বিটা লেভেলে। আলফায় আপনার এই ষড়যন্ত্র ফলবে না।

ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পৌঁছে আপনি যদি কোনো ধরনের বুদ্ধিমান অস্তিত্বকে দলে ভিড়িয়ে তাকে দিয়ে খারাপ কোনো কাজ করিয়ে নেয়ার কুমতলব আঁটেন, সেটা হবে রেডিওর নব ঘুরিয়ে অস্তিত্বহীন স্টেশনের গান শুনতে চেষ্টা করার মতোই নিষ্ফল।

কেউ কেউ ব্যাপারটা বিশ্বাস করে না। তাদের প্রশ্ন, অভিশাপ যদি সত্যি হয়, শয়তান উপাসকরা যদি মানুষের ক্ষতি করতে পারে, মনকে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা কেন তা পারবো না? কেন পারা যায় না, সেটা বলা কঠিন, কিন্তু পারা যায় না সেটা গবেষণায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। এসব কাজ বিটায় করা যায়, আলফাতে নয়, থিটাতে নয়, সম্ভবত ডেলটাতেও নয়।

সময় নষ্ট করানোর পক্ষপাতী নই আমরা, তবু যদি আপনার সন্দেহ থাকে, নিজেই ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ধ্যানমগ্ন হোন, কারো মাথায় ব্যথা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে দেখুন। সফল হওয়ার জন্যে যে সব নিয়ম রীতি পালন করে তৈরি করা পর্দায় ছবি দেখতে হয়, সেগুলো যদি নির্ভুল, নিখুঁত ভাবে পালন করতে পারেন, ফল হবে দুটোর একটা—হয় আপনি, আপনার সাবজেক্ট নয়, মাথাব্যথার শিকার হবেন অথবা আলফা লেভেলে থাকা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।

মনের ভালো এবং মন্দ দিক সম্পর্কে যে-সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনি, সেসবের উত্তর এর মধ্যে পাবেন না। এ ব্যাপারে পরে আরো আলোচনা করবো। এখন, এমন একটা ঘটনা বেছে নিন যেটা কোনো সমস্যার সমাধান, যেটার সমাধান আপনি চান বা বাসনা করেন, আপনার মনে বিশ্বাস আছে ব্যাপারটা ঘটতে পারে।

বাকি থাকলো, প্রতীক্ষা বা প্রত্যাশা করা। নিচের অনুশীলনের সাহায্যে, আসুন, প্রত্যাশা করাটাও শিখে নেয়া যাক।

আপনাকে অসুবিধের মধ্যে ফেলছে এই রকম একটা সমস্যা বেছে নিন, যে সমস্যার কারণ এখনো আপনার কাছে পরিষ্কার নয়। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, আপনার বস্ কিছুদিন থেকে খুব বদমেজাজী হয়ে আছেন। আপনি আপনার লেভেলে রয়েছেন, এখন তিনটে কাজ করতে হবে আপনাকে।

প্রথম কাজ। আপনার মনের পর্দায় পরিষ্কার, উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়ে তুলুন সম্প্রতি ঘটা একটি ঘটনা বা দৃশ্য, যেটার সাথে আপনার সমস্যা জড়িয়ে আছে।

দ্বিতীয় কাজ। এই ঘটনা বা দৃশ্যের ছবি ধীরে ধীরে ডান দিকে সরিয়ে পর্দা থেকে বের করে দিন। এবার বাঁ দিক থেকে পর্দার ওপর আরেকটা ঘটনা বা দৃশ্যের ছবি নিয়ে আসুন, যেটা আগামীকাল ঘটবে। এই দৃশ্যে আপনি দেখবেন আপনার বসের চারদিকে যারা রয়েছে তারা সবাই হাসিখুশি, আপনার বস্ একটা সুখবর শুনছেন। বোঝাই যাবে, তার মেজাজ এখন আগের চেয়ে ভালো। সমস্যার কারণটা কি তা যদি আপনি সঠিক ভাবে জানেন, সমাধান ঘটছে এই দৃশ্যটাও চাক্ষুষ করুন। সমস্যাটা যেরকম নিখুঁতভাবে মনের পর্দায় দেখেছিলেন, সমাধানটাও সেরকম নিখুঁত আর পরিষ্কারভাবে দেখুন।

তৃতীয় কাজ। এবার এই দৃশ্যটাও ডান দিকে সরিয়ে পর্দা থেকে বের করে দিন। বাঁ দিক থেকে আরেকটা দৃশ্য নিয়ে আসুন পর্দায়। আপনার বস্ এখন হাসিখুশি, আনন্দিত—যতোটা তিনি আনন্দিত হতে পারেন বলে মনে করেন আপনি, ততোটা। দৃশ্যটা এতো পরিষ্কার ভাবে দেখতে হবে আপনাকে, যেন বাস্তবে সেটা সত্যি ঘটেছে। বেশ একটু সময় নিয়ে দৃশ্যটা দেখুন, গভীরভাবে অনুভব করুন ব্যাপারটা।

এবার, এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুণে সম্পূর্ণ জেগে উঠবেন আপনি, আগের চেয়ে ভালো বোধ করবেন। প্রয়োজনীয় সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। একটা শক্তিকে কাজে নামিয়ে দিয়েছেন আপনি। বিশ্বাস করুন, ওই শক্তি ঘটনাটা ঘটিয়ে ছাড়বে। দেখবেন সত্যিই ঘটছে!

এটা কি সব সময় কাজ করবে, প্রতিবার?

উঁহুঁ।

তবে, আপনি যদি এটা চর্চা করতে থাকেন, আপনার অভিজ্ঞতা হবে এই রকম।—ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সমস্যা সমাধানের প্রথম প্রচেষ্টা সফল হবে। সফল হলেও, কে বলবে এটা একটা কাকতালীয় ঘটনা নয়? এ-কথা তো ঠিক যে সমস্যাটা সমাধানযোগ্য এই বিশ্বাস আপনার ছিলো বলেই ওটাকে আপনি বেছে নিয়েছিলেন। সমাধানের সম্ভাবনা ছিলো বলেই না আপনি বিশ্বাস করেছিলেন সমাধান হবে। তারপর, দ্বিতীয় বার চেষ্টা করে দেখলেন। এবারও আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। সমাধান হয়ে গেল তৃতীয় বা চতুর্থ সমস্যারও। এভাবে, কাকতালীয় ঘটনার সংখ্যা একের পর এক বাড়তেই থাকবে। কিন্তু ধ্যানমগ্ন হওয়ার অভ্যেস এবং অন্যান্য অনুশীলন চর্চা করা ছেড়ে দিন, কাকতালীয় ঘটনার সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে। আবার চর্চা শুরু করুন, সংখ্যায় ওগুলো বাড়তে শুরু করবে আবার।

চর্চা চালিয়ে গেলে ধীরে ধীরে নৈপুণ্য এবং দক্ষতা বাড়বে আপনার। সমাধানের সম্ভাবনা আগেরগুলোর চেয়ে একটু কম, এবার এই জাতের সমস্যা দূর করতে সক্ষম হবেন আপনি। তারপর সময়ের সাথে সাথে, চর্চা করতে থাকায়, আপনার সাফল্যগুলো হয়ে উঠবে বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য।

প্রতিটি সমস্যা নিয়ে কাজ করার সময়, শুরুতেই এর আগের সাফল্যের অভিজ্ঞতাটা মনের পর্দায় অল্প সময়ের জন্যে ফুটিয়ে তুলুন। পরে, এরচেয়ে উন্নত কোনো সাফল্যের অভিজ্ঞতা অর্জিত হলে, এটাকে বাদ দিয়ে নতুনটাকে রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করুন।

মেক্সিকোর একজন ছাত্র, অবসর সময়ে ট্যাক্সিও চালায়। আরোহী পাবার জন্যে ধ্যান পদ্ধতি নিয়মিত ব্যবহার করে সে। বাজার মন্দা, এই সময় একদিন চলে গেল নিজের লেভেলে, ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মনে তৈরি করা পর্দায় স্যুটকেস হাতে একজন লোকের ছবি দেখলো, যে এয়ারপোর্টে যেতে চায়। প্রথম কয়েকবার কিছুই ঘটলো না। তারপর ব্যাপারটা ঘটলো, স্যুটকেস হাতে সত্যি সত্যি এলো একজন লোক, এয়ার-পোর্টে যেতে চায়। পরের বার মনের পর্দায় এই লোকটার ছবি ফোটালো সে, সব ভালো ভাবে ঘটলে যেমন লাগে সেই রকম একটা অনুভূতি হলো তার, এবং সেই সাথে আরেকজন আরোহী এলো, সে-ও এয়ারপোর্টে যাবে।

আশা করা যায় এই পুনরাবৃত্তি তার জীবনে বার বার ঘটতেই থাকবে, চর্চা যদি বন্ধ না করে।

অন্যান্য অনুশীলন আর টেকনিকে যাবার আগে একটা কথা। প্রশ্নটা সম্ভবত আপনার মনেও উঁকি দিয়েছে। বলেছি, ছবিগুলোকে বাঁ দিক থেকে পর্দায় নিয়ে এসে ডান দিক দিয়ে বের করে দেবেন। কেন?

কারো কারো গবেষণায় দেখা গেছে, গভীর লেভেলে পৌছে আমাদের মন উপলব্ধি করে, সময় বাঁ দিক থেকে ডান দিকে বয়ে যাচ্ছে। অন্য কথায়, ভবিষ্যৎ আমাদের বাঁ দিকে আর অতীত আমাদের ডান দিকে, এই ধারণা জন্মায়। সম্ভব হলে পরে এটা নিয়ে আরো আলোচনা করবো আমরা। তার আগে হাতের অন্যান্য কাজ সারতে হবে।

তিন

স্মরণশক্তি ও তিন আঙুলের কেরামতি

মন নিয়ন্ত্রণ টেকনিকের সাহায্য নিলে, টেলিফোন গাইড ব্যবহার করার দরকার হবে না আপনার, সবগুলো টেলিফোন নাম্বার মনে থাকবে। স্বভাবতই, আপনার এই ক্ষমতা আরো উন্নয়ন

দেখে তাজ্জব হয়ে যাবে বন্ধুরা। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন আসছে, আপনি কি আসলেও টেলিফোন নাম্বার মনে রাখতে চান? আমি জানি, অনেকে চায় না। কোনো নাম্বার দরকার হলে গাইডের বা নোট বুকের পাতা উল্টে সেটা বের করে নেয় তারা। আগেই বলেছি, ফল পেতে হলে বাসনা থাকা চাই। টেলিফোন নাম্বার স্মরণ রাখার বাসনা অনেকের ততোটা জোরালো নয়। কিন্তু টেলিফোন নাম্বার দরকার হলেই যদি প্রতিবার শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটতে হতো, বাসনাটা তাহলে জোরালো না করে উপায় থাকতো না।

বাসনা, বিশ্বাস আর প্রত্যাশা এই তিন বিধির কারণে শুধু গুরুত্বপূর্ণ কাজে ছাড়া এই টেকনিক ব্যবহার করা উচিত নয়। এই তিন বিধি ঠিকমতো পালন না করলে কোনো কাজে সাফল্য আশা করা বোকামি হয়ে যাবে। আমরা অনেকেই আমাদের স্মরণশক্তি বাড়াতে চাই, কারণ এই শক্তিটা যথেষ্ট পরিমাণে নেই বলে মনে করি। কিন্তু এই অভাববোধটাই যথেষ্ট নয়। কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে স্মরণশক্তি বাড়লে আপনি সত্যি উপকৃত হবেন, উপকৃত হতে চান, সেটা আগে নির্ধারণ করতে হবে আপনাকে। ভেবে-চিন্তে দেখুন, কি ধরনের বিষয় স্মরণ করতে না পারার দরুন আপনাকে বিপদে বা অসুবিধায় পড়তে হয়। তারপর পরিমাপ করুন, এই অক্ষমতা দূর করার জন্যে নিজের মধ্যে কতোটুকু আগ্রহ এবং বাসনা রয়েছে। পরিমাণ যদি কম হয়, বাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করুন।

আগের পরিচ্ছেদের অনুশীলনগুলো আপনি যদি চর্চা করে দক্ষতা অর্জন করে থাকেন, হয়ত অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার স্মরণশক্তি আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। আলফায় পৌঁছে মনের পর্দায় ছবি দেখতে এবং অতীতের ঘটনা জ্যান্ত করে তুলতে শেখা, এগুলো আপনাকে নতুন যোগ্যতা এনে দিয়েছে। আলফা লেভেলের এই কাজকর্ম বিটা লেভেলের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে, কাজেই আপনি আলাদা ভাবে চেষ্টা না করলেও আপনার মন হয়ত নানা ভাবে আপনার উপকারে লাগতে চাইছে। তবু, আরো অনেক উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে।

আপনি যা ভুলে গেছেন বলে বিশ্বাস করছেন সেটা নিশ্চয়ই কোনও ঘটনার সাথে জড়িত। সেটা যদি একটা নাম হয়, এখানে ঘটনা হবে সময়, যখন নামটা আপনি শুনেছেন বা পড়েছেন। হারিয়ে যাওয়া একটা জিনিস মন থেকে খুঁজে বের করা কঠিন কোনো কাজ নয়। মনের পর্দা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে তো আপনি জানেনই। আপনাকে শুধু সংশ্লিষ্ট ঘটনাটা মনের পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে হবে, তাহলেই যেটা মনে করতে চাইছেন, মনে পড়ে যাবে।

আসলে আমরা বোধহয় কেউই কিছু ভুলে যাই না। বড়জোর বলা যেতে পারে, মনে করতে পারি না। দুটোর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে।

বিজ্ঞাপন জগত ভুলে যাওয়া আর মনে করতে না পারার পার্থক্যটা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরে। টি.ভি.র বিজ্ঞাপন আমরা অনেকেই দেখি। সংখ্যায় ওগুলো এতো বেশি আর এতো অল্প সময়ের জন্যে দেখানো হয় যে গত হপ্তায় যেগুলো দেখেছি সেগুলো থেকে দশটার একটা তালিকা তৈরি করতে বললে আমরা হয়ত বা তিন কি চারটের বেশি মনে করতে পারবো না।

ধরুন, সিগারেট, লিপস্টিক আর ব্যাটারীর কথা আপনার মনে আছে। আপনি মার্কেটে গেলেন, নারকেল তেল কিনবেন। দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই টি. ভি.তে দেখা নারকেল তেল কোম্পানির বিজ্ঞাপনটার কথা মনে পড়ে গেল আপনার। আসলে বিজ্ঞাপনগুলো আমাদের সচেতন মনে যতোটা তারচেয়ে বেশি ছাপ ফেলে অবচেতন মনে, সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ না এলে অবচেতন মন থেকে তথ্যটা সচেতন মনে সহজে উঠে আসে না।

তা সে যতোই তুচ্ছ আর নগণ্য হোক, প্রতিটি বিষয় আর ঘটনারই ছাপ নেয় আমাদের ব্রেন। বিষয়টা আমাদের কাছে যতো গুরুত্বপূর্ণ আর ছাপটা যতো স্পষ্ট হয়, ততো তাড়াতাড়ি আর সহজে সেটা আমরা মনে করতে পারি।

সার্জিক্যাল অপারেশনের সময় একটা ইলেকট্রোড ব্রেনকে আলতোভাবে স্পর্শ করলো। জাদুর কাঠির ছোঁয়া পেয়ে বহুকাল আগে ভুলে যাওয়া একটা ঘটনা খুঁটিনাটি বিবরণসহ পুরোটাই মনে পড়ে গেল, এতোই পরিষ্কার ভাবে যে আওয়াজ শুনতে, ঘ্রাণ নিতে এবং ছবি দেখতে পাওয়া গেল। ছোঁয়া হলো ব্রেনকে, মনকে নয়। অতীত ঘটনা ফিরিয়ে আনা থেকে শুরু করে রোগীকে সচেতন করে তোলা পর্যন্ত সমস্ত প্রস্তাবই আসছে ব্রেনের কাছ থেকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে (ব্রেন) জানতে পারে, 'কিছু একটা' বলে দেয় তাকে—আসলে, এগুলো সে নিজে উদ্ধার করছে না। এখানেই কাজ করছে মন—মহা-পর্যবেক্ষক, মহা-শক্তিশালী, সবই যে ব্যাখ্যা করতে পারে—কখনো কোনো ইলেকট্রোড যাকে স্পর্শ করতে পারেনি বা পারবে না। আমাদের নাকের ডগার মতো মন নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় বিরাজ করে না।

ফিরে আসা যাক স্মরণ প্রসঙ্গে। আপনি যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে একটা গাছ, সেই গাছ থেকে একটা পাতা ঝরে পড়ছে। এই ঘটনা আপনি মনে করতে পারবেন না, কারণ ঘটনাটা আপনি চাক্ষুষ বা অনুভব করেননি, সেটা আপনার জন্যে কোনো গুরুত্বও বহন করে না।

এই যে আপনি চেয়ারে বসে বইটা পড়ছেন, এই পড়ার সময়েও হাজার হাজার অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন আপনি অথচ সে ব্যাপারে আপনি পুরোপুরি সচেতন নন। আশপাশে যা ঘটে চলেছে, আপনি যা অনুভব করছেন, এক লাখ ভাগের এক ভাগও আপনি তা সচেতন ভাবে উপলব্ধি করছেন না, কারণ আপনার সমস্ত মনোযোগ রয়েছে পড়ার দিকে। শব্দ হচ্ছে, গন্ধ আছে, আপনার চোখের কোণে দৃশ্য আছে, আপনি চেয়ারটার স্পর্শ অনুভব করছেন, হয়তো ঘাড়ে একটা মশা বসেছে, হয়তো ডান পায়ের জুতো আঁটো হওয়ায় একটু কষ্ট হচ্ছে, কামরার টেমপারেচার···এর কোনো শেষ নেই। এসব ব্যাপারে আপনি একেবারে সচেতন নন, তা নয়, কিন্তু সতর্কতার সাথে, সরাসরি সচেতন নন। ব্যাপারটা ঘোলাটে, পরস্পর বিরোধী লাগছে? তাহলে এক মহিলার কথা আলোচনা করা যাক, প্রসব করানোর জন্যে যাকে জেনারেল অ্যানেসথেশিয়ার সাহায্যে অজ্ঞান করা হয়েছিল। তার ঘটনাটা আমাদেরকে আরো পরিষ্কার ভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

সন্তান পেটে থাকার সময় এই মহিলা ও তার চিকিৎসকের মধ্যে সুন্দর একটা

সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দু'জনের প্রতি দু'জনের গভীর বন্ধুত্ব এবং আস্থা ছিলো। সন্তান প্রসবের সময় হতে রুটিন অনুসারে জেনারেল অ্যানেসথেশিয়ার সাহায্যে অজ্ঞান করা হলো মহিলাকে, স্বাস্থ্যবান নিরোগ এক সন্তানের জন্ম দিলো সে। কয়েক ঘন্টা পর আবার যখন তাকে দেখতে এলো ডাক্তার, আশ্চর্য রকম এড়িয়ে যাওয়া ব্যবহার করলো মহিলা, এমন কি অকারণে রেগে উঠতেও দেখা গেল তাকে। সেদিন, পরদিন, তারপর দিন, একই ঘটনা ঘটতে লাগলো। মহিলা কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ এভাবে বদলে গেল কিভাবে, ডাক্তার বুঝতে পারে না। মহিলার মনেও এই প্রশ্ন, ডাক্তারের ওপর এই বিতৃষ্ণা কেন আমার? দু'জনেই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে লাগলো এর কারণ আবিষ্কারের জন্যে। হঠাৎ এই পরিবর্তন, এর একটা ব্যাখ্যা না থেকেই পারে না।

ওরা ভাবলো, মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা কোনো স্মৃতি হয়তো এই পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। তাই ঠিক হলো, সম্মোহনের সাহায্য নেবে তারা।

সম্মোহিত করা হলো মহিলাকে। ডাক্তারের সাথে অতি সম্প্রতি যা যা ঘটেছে এক এক করে স্মরণ করিয়ে ধীরে ধীরে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো আরো পিছনের ঘটনার দিকে। বেশি পিছনে যেতে হলো না, পাওয়া গেল সমাধান।

গভীর সম্মোহিত অবস্থায় ডেলিভারি রুমে তার জ্ঞান ফিরে আসার ঘটনাটা স্মরণ করতে পারলো মহিলা। এর সংলগ্ন পিছনের ঘটনাটা তার মনে থাকার কথা নয়, কারণ তখন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলো সে। কিন্তু আশ্চর্য! দেখা গেল, অপারেশন চলাকালে ডাক্তার আর নার্স যা যা বলেছে সব তার মনে আছে। অজ্ঞান একজন রোগিনীর সামনে কথা বলেছে তারা, কথা আর আচরণের মধ্যে তাই ফুটে উঠেছিল নির্লিপ্ত একটা ভাব। কখনো মহিলাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে তারা, কখনো সন্তান প্রসব হতে দেরি হচ্ছে দেখে বিরক্তি প্রকাশ করেছে। তাকে একটা জড় পদার্থ হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছিল, ব্যক্তি হিসেবে নয়। তার বোধ আর অনুভূতির কথা বিবেচনা করা হয়নি।

তাই প্রশ্ন ওঠে, আদৌ কি অজ্ঞান বা অচেতন হওয়া সম্ভব? আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা হয় মনে করতে পারি বা পারি না, কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তে আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করছি এবং প্রতিটি অভিজ্ঞতাই স্পষ্ট ছাপ রাখছে ব্রেনের ওপর।

তবে কি এর মানে এই যে আজ থেকে দশ বছর পর এই পৃষ্ঠাটির নম্বর মনে করার কৌশল শিখতে পারবেন আপনি? পৃষ্ঠার নম্বরটি আপনি হয়তো লক্ষ্য করেননি, কিন্তু ওটা আছে। বলা যেতে পারে, চোখের কোণ দিয়ে ওটাকে আপনি দেখেছেন। হয়তো শিখতে পারবেন, কিন্তু সম্ভাবনা কম। কারণ ব্যাপারটা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, এবং সম্ভবত কোনো কালেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে না।

কিন্তু গত হপ্তায় সুদর্শন যে যুবকটিকে এক আত্মীয়ের বাড়িতে দেখেছিলেন, তার নাম মনে করতে পারবেন কি? আপনি যখন প্রথম নামটা শুনলেন, ওই সময়টাই একটা ঘটনা। সহজ কাজ যেটা আপনাকে করতে হবে, ওই সময়ের আশপাশের সময়গুলোকে মনের পর্দায় ফুটিয়ে তোলা। নির্দিষ্ট একটা ঘটনার কথা মনে করতে পারছেন না, কিন্তু তার আগে পরে কি ঘটেছে তা আপনার মনে আছে। আগের ঘটনাগুলো মনের পর্দায় ফুটিয়ে তুলুন, ধীরে ধীরে ভুলে যাওয়া ঘটনার দিকে এগোন, নামটা আপনি আবার শুনতে পাবেন।

আরাম করে বসুন। হাত-পা ঢিল করে দিন। নিজের লেভেলে চলে যান। পর্দায় ছবি দেখুন। এতে সময় লাগবে আপনার পনেরো থেকে বিশ মিনিট। তবে আরো একটা উপায় আছে, এ-ও জাদুমন্ত্রের মতো কাজ দেয়। এটাকে সাধারণত ইমার্জেন্সী মেথড বলা হয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে তৎক্ষণাৎ মনের এমন একটা লেভেলে পৌঁছে যাবেন আপনি, যেখান থেকে তথ্য মনে করতে পারা খুব সহজ।

বোতামে চাপ দিলে আলো জ্বলে, বলতে পারেন এই পদ্ধতিটিও সেই রকম একটা বোতাম। বোতামটা যখন সত্যি আপনার হয়ে যাবে, তারপর থেকে যতোই ওটাকে ব্যবহার করবেন ততোই ওর কর্ম-গুণ বাড়তে থাকবে। জিনিসটাকে নিজের করার জন্যে বার কয়েক ধ্যানমগ্ন অবস্থার সাহায্য নিতে হবে আপনাকে।

সহজ এই পদ্ধতি। বৃদ্ধ, তর্জনী আর মধ্যমা, এই তিনটে আঙুল একসাথে করুন, সাথে সাথে মনের একটা গভীর লেভেলে পৌঁছে যাবেন আপনি। এই মুহূর্তে চেষ্টা করতে পারেন আপনি, কিছুই ঘটবে না। জিনিসটা এখনো আপনার পোষ মানেনি, তাই আপনার আদেশ মানবে না। পোষ মানাতে হলে একটু খাটতে হবে। রাজি?

নিজের লেভেলে চলে যান, তারপর নিজেকে বলুন, (শব্দ করে বা মনে মনে), 'যখনই আমার এই তিন আঙুল এক করবো'—এখন এক করুন—'কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে, তখনই মনের এই লেভেলে চলে আসবো, এবং আমার উদ্দেশ্য পূরণ হবে।'

এই অনুশীলন প্রতিদিন এক হপ্তা চর্চা করুন। প্রতিবার একই বাক্য ব্যবহার করা উচিত। দিন কয়েকের মধ্যেই আপনার মন তিন আঙুল এক করার সাথে সাথে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। তারপর একদিন হয়ত একটা কিছু মনে করতে চেষ্টা করবেন আপনি—হয়ত একটা নাম—কিন্তু কোনোমতেই সেটা মনে পড়বে না। যতোই চেষ্টা করবেন, ততোই গোঁ ধরে থাকবে নামটা, কিছুতেই মনে আসতে চাইবে না। ইচ্ছাশক্তি শুধু যে ব্যর্থ হবে তাই নয়, ওটা একটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এই যখন অবস্থা, আপনাকে ঘাবড়াতে নিষেধ করবো। শান্ত হোন। বুঝতে চেষ্টা করুন যে নামটা আপনার মনে পড়বে, কারণ আপনার আয়ত্তে রয়েছে সেই বোতাম, যেটা টিপলেই মনে পড়ে যাবে নামটা।

বিদেশী এক স্কুল শিক্ষক ছাত্রদেরকে বানান শেখাবার জন্যে তিন আঙুল পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। হপ্তায় বিশটা করে শব্দের বানান শেখাতে পারেন তিনি। ছাত্রদের পরীক্ষা করার জন্যে এক এক করে প্রতিটি শব্দের বানান তিনি জিজ্ঞেস করেন না, চলতি হপ্তায় যে ক'টা নতুন শব্দ তারা শিখেছে সবগুলো খাতায় লিখতে বলেন তিনি। তিন আঙুল পদ্ধতির সাহায্যে, মনের পর্দায় নতুন শেখা শব্দগুলো দেখতে পায় ছাত্ররা, নির্ভুল বানান সহ সেগুলো খাতায় লিখতে কোনো অসুবিধে হয় না তাদের। এই পরীক্ষায় সবচেয়ে মাথামোটা ছাত্রটির সফল হতে সময় লাগে পনেরো মিনিট।

ট্যাক্সি ড্রাইভার ছাত্রটির কথা মনে আছে? তার একটা বিদঘুটে সমস্যা ছিলো। একজন আরোহী হয়ত এমন এক জায়গায় যেতে চাইলো, যেখানে অনেক দিন আগে একবার গেছে ড্রাইভার, রাস্তাঘাট এখন আর ভালো করে মনে নেই। গাড়ি স্টার্ট দেয়ার

আগে একটু সময়ের জন্যে ধ্যানমগ্ন হলে খুব কম আরোহীই সেটা ধরতে পারবে। তিন আঙুলের পদ্ধতি ব্যবহার করে মনের পর্দায় ভুলে যাওয়া জায়গাটা দেখে নেয় সে। পদ্ধতিটি শেখার পর থেকে এই ধরনের কোনো সমস্যায় পড়ে ভুগতে হয় না তাকে।

মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখার আগে ছাত্রটি লেখাপড়ায় মোটেও ভালো ছিলো না। তারপর দ্রুত শেখা বা স্পীড লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করা ধরলো সে। ছাত্র হিসেবে এখন সেরাদের একজন সে, তিন আঙুল পদ্ধতি ব্যবহার করে পরীক্ষা দিয়ে আশ্চর্য ভালো রেজাল্ট করছে। এই পদ্ধতি সম্পর্কে পরের পরিচ্ছেদে আলোচনা করবো আমরা। তার আগে তিন আঙুল পদ্ধতি কোন্ কাজে কিভাবে ব্যবহার করবেন, সে-সম্পর্কে কিছু অনুশীলন।

এক নম্বর পরিচ্ছেদে তিন—এক (৩-১) পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, মনে আছে তো? এখানে ওই পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে হবে।

প্রথম কাজ, যে-কোনো হাতের প্রথম তিনটে আঙুল এক করুন। এটা ব্যবহার করায় ইতিমধ্যে আপনি যদি অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, আঙুল তিনটে এক করার সাথে সাথে বিটা থেকে গভীর লেভেলে পৌঁছে যাবেন।

স্কুল বা কলেজের একটা পড়া মুখস্থ করতে চান আপনি। তিন আঙুল তো এক করাই আছে, এবার তিন—এক পদ্ধতি ব্যবহার করে আরো গভীর লেভেলে চলে যান। তারপর নিজেকে বলুন, আপনি এক থেকে তিন পর্যন্ত গুণতে যাচ্ছেন, এবং তিন পর্যন্ত গোণার সাথে সাথে চোখ খুলে পড়াটা পড়তে শুরু করবেন। পড়াটা কি, শিরোনাম এবং বিষয় উল্লেখ করুন।

তারপর বলুন, 'কোনো শব্দ আমার মনোযোগ নষ্ট করতে পারবে না, আমার মনোনিবেশে একাগ্রতা এবং বুঝতে পারার ক্ষমতা অনেক গুণ বেড়ে যাবে।'

এবার এক থেকে তিন পর্যন্ত গুণুন, চোখ মেলুন, এবং পড়তে শুরু করুন।

পড়াটা শেষ করে, আবার তিন—এক পদ্ধতির সাহায্যে গভীর লেভেলে চলে যান, তারপর নিজেকে বলুন, 'এই মাত্র যে পড়াটা আমি শেষ করলাম (পড়াটা কি, শিরোনাম এবং বিষয় উল্লেখ করুন), সেটা আমি তিন আঙুল পদ্ধতির সাহায্যে ভবিষ্যতে যখন খুশি চাইলেই মনে করতে পারবো।'

কলেজের লেকচার মনে রাখতে চান আপনি। তিন আঙুল তো এক করা আছেই, এবার তিন—এক পদ্ধতি ব্যবহার করে গভীর লেভেলে চলে যান। তারপর নিজেকে মনে মনে বলুন, আপনি একটা লেকচার শুনতে যাচ্ছেন (শিরোনাম, বিষয় এবং লেকচারের নাম উল্লেখ করুন)।

নিজেকে বলুন, আপনি তিন আঙুল পদ্ধতি ব্যবহার করতে যাচ্ছেন, লেকচার চলাকালে চোখ খোলা রাখবেন, অন্য কোনো শব্দ আপনার মনোযোগ নষ্ট করবে না, আপনার একাগ্রতা এবং বুঝতে পারার ক্ষমতা অনেক গুণ বেড়ে যাবে, এবং লেকচারটা (শিরোনাম বিষয় এবং লেকচারারের নাম উল্লেখ করুন) ভবিষ্যতে যখন খুশি চাইলেই তিন আঙুল পদ্ধতির সাহায্যে মনে করতে পারবেন।

এবার নতুন একটা পদ্ধতি। এটাকে আমরা তিন দফা পদ্ধতি বলতে পারি।

প্রথম দফা।

পরীক্ষার হলে প্রশ্নগুলো যেভাবে সব সময় পড়েন, সেভাবেই পড়ুন, তবে কোনো বিষয় নিয়েই বেশিক্ষণ মাথা ঘামাবেন না। কোনো প্রশ্নের উত্তর যদি তৈরি থাকে, সাথে সাথে লিখে ফেলুন। আর তৈরি না থাকলে ওটাকে বাদ দিয়ে পরেরটা ধরুন।

দ্বিতীয় দফা।

তিন আঙুল পদ্ধতির সাহায্যে প্রথম দফায় যা করেছেন এবারও তাই করুন, তবে এবার যে-সব প্রশ্নের উত্তর তৈরি নেই সেগুলোর ওপর একটু বেশি সময় দিন। উত্তর যদি আসে, লিখে ফেলুন। আর যদি না আসে, ওটাকে বাদ দিয়ে পরেরটা ধরুন।

তৃতীয় দফা।

তিন আঙুল পদ্ধতি ব্যবহার করে যে-সব প্রশ্নের উত্তর আসেনি সেগুলো পড়ুন, এবারও যদি উত্তর না আসে, চোখ বন্ধ করুন, বন্ধ পাতার ভেতর একটু ওপর দিকে স্থির করুন দৃষ্টি, আপনার প্রফেসর, টিচার বা লেকচারারকে মনের পর্দায় দেখুন, তারপর প্রশ্নের উত্তরটা জিজ্ঞেস করুন তাঁকে। তারপর মাথা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার উত্তর পাবার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করুন।

তিন আঙুল পদ্ধতির আরো ব্যবহার আছে। ধ্যানী সাধু আর যোগীরা এই পদ্ধতি কয়েক শতাব্দী আগে থেকে ব্যবহার করে আসছেন। যখন কোনো যোগী বা সাধুর ধ্যানমগ্ন অবস্থার ছবি বা ভাস্কর্য দেখবেন, লক্ষ্য করলেই চোখে পড়বে, তাঁর হাতের তিনটে আঙুল এক করা।

চার

দ্রুত শেখা

তিন আঙুল পদ্ধতি চর্চা করে আপনি যদি দক্ষতা অর্জন করতে পারেন, দৈনন্দিন হাজারটা কাজে একে ব্যবহার করে উপকার পাবেন। এক সময় মনে করতে পারাটা এমন অভ্যেস হয়ে উঠবে, বিটা লেভেলে থাকা অবস্থায়ও কিছু মনে করতে চাইলে সাথে সাথে মনে পড়ে যাবে আপনার। এটা অনুশীলন করার আরেকটা উপকার, আপনার মনঃসংযোগের ক্ষমতা আশ্চর্য রকম বেড়ে যাবে। আপনি যদি ছাত্র হন, পরীক্ষার সময় তিন আঙুল এক করে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় আবিষ্কার করবেন, যে-বইটা আপনি পড়েছেন সেটা চোখের সামনে প্রায় খোলা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছেন। প্রশ্নটা নিয়ে স্যার

যে আলোচনা করেছেন ক্লাসে, সবটা প্রায় পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন।

এখানে আরো একটা পদ্ধতির কথা বলবো। এটা আগেরগুলোর মতো অতোটা সহজ নয়, কিন্তু মন-নিয়ন্ত্রণ চর্চা শুরু করার প্রথম দিকেই এ-ব্যাপারে তৈরি থাকতে হবে আপনাকে। এই পদ্ধতিরও বৈশিষ্ট্য হলো, শুধু আলফা লেভেলে নয়, বিটা লেভেলেও সমান ভাবে কার্যকরী। এটা অনুশীলন করতে হলে একটা টেপ রেকর্ডার দরকার হবে।

ধরা যাক, টেকস্ট বুকের অত্যন্ত জটিল একটা পরিচ্ছেদ শিখতে হবে আপনাকে। ওটা শুধু মনে রাখলেই চলবে না, বুঝতেও হবে। প্রথম দিকে আলফা লেভেলে যাবার দরকার নেই, বিটায় থাকুন। পড়াটা আওয়াজ করে পড়ুন, রেকর্ড হয়ে যাক টেপে। এবার আপনি আলফা লেভেলে চলে যান, টেপ রেকর্ডার চালু করে পড়াটা শুনুন, নিজের কণ্ঠস্বরের দিকে গভীর মনোযোগ রাখুন।

মন নিয়ন্ত্রণ করতে শেখার প্রথম দিকে, বিশেষ করে আপনি যদি টেপ রেকর্ডার ব্যবহারে অভ্যস্ত না হন, প্লে-ব্যাক সুইচ চাপ দেয়ার সময় ধ্যান ভেঙে যেতে পারে আপনার, আলফা থেকে উঠে আসতে পারেন বিটায়। তারপর এমনও হতে পারে, টেপ রের্কডারের শব্দ আবার আলফায় ফিরে যেতে বাধার সৃষ্টি করবে। বাধা টপকে আবার যদি আলফায় যেতে পারেনও, তখন হয়তো দেখবেন, পড়াটা সবটুকু বা প্রায় সবটুকু শেষ করে বসে আছে টেপ।

এসব বিঘ্ন এড়াবার জন্যে দু'একটা পরামর্শ দেয়া গেল।

টেপের সুইচে আঙুল রেখে তারপর ধ্যানমগ্ন হোন। এতে চোখ খুলে সুইচ হাতড়াবার ঝামেলা নেই।

কিংবা কারো সাহায্য নিন, আপনার ইঙ্গিত পেলে প্লে-ব্যাক সুইচে চাপ দেবে সে।

নতুন করে তাড়াতাড়ি আলফায় যাবার জন্যে তিন আঙুল পদ্ধতি ব্যবহার করুন।

কিন্তু সমস্যাটা আসলে যতো কঠিন তারচেয়ে বেশি কঠিন বলে মনে হতে পারে। সত্যি কথা হলো, আপনি যে উন্নতি করছেন এটা তারই লক্ষণ। যতোই আপনি অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন, ধ্যানমগ্ন অবস্থাটা ততোই অন্য রকম লাগবে আপনার কাছে। যতো দিন যাবে, বিটা লেভেলের সাথে আলফা লেভেলের পার্থক্য ততোই কমতে থাকবে, তার কারণ আলফা লেভেলটাকে আপনি সচেতন ভাবে ব্যবহার করতে শিখে ফেলবেন। কাজেই তন্দ্রাচ্ছন্ন বা মোহাচ্ছন্ন যদি না হন, সেটাকে আলফায় পৌঁছুতে ব্যর্থ হচ্ছেন বলে ধরে নেয়া ঠিক হবে না।

চর্চা আর অনুশীলনের সাথে সাথে আপনার দক্ষতা বাড়বে, এক সময় এতো সহজে আলফা লেভেলে পৌঁছে যাবেন যে প্রায় সময় টেরই পাবেন না—আর তখন যদি লেভেলে পৌঁছুবার প্রথম দিককার লক্ষণগুলো নতুন করে অনুভব করেন, বুঝতে হবে আপনি আরো গভীর লেভেলে চলে যাচ্ছেন, হয় আলফার আরো গভীরে কিংবা থিটায়। ড. সিলভার ট্রেনিং কোর্সের ক্লাসে অনেক ছাত্রকেই গভীর লেভেলে পৌঁছেও চোখ খোলা রাখতে দেখা যায়, আপনি এই মুহূর্তে যতোটুকু জেগে আছেন ততোটুকু জেগে থেকে পরিষ্কার ভাবে কথা বলে, প্রশ্নের উত্তর দেয়, হাসি-ঠাট্টা করে। আলফায় মনের সম্পূর্ণ কার্যকারিতা সহ পুরোপুরি জেগে থাকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এতো সাধ্য-সাধনা তো এ

অবস্থাটা অর্জন করার জন্যেই।

আবার আপনার টেপ রেকর্ডিঙের কথায় ফিরে আসা যাক। শক্তি জড়ো করে আবার জোর দেয়ার জন্যে, কয়েকটা দিন বিরতি নিন, তারপর আবার বিটা লেভেলে পড়াটা পড়ুন, আলফায় পৌঁছে প্লে-ব্যাকটা শুনুন। আশা করা যায় তথ্যগুলো এবার আপনার অন্তরের অন্তস্তলে গেঁথে যাবে।

এই বই পড়ে কয়েকজন যদি এক সাথে মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখেন, তাহলে ভালো হয়। সেক্ষেত্রে খাটা-খাটনি ভাগাভাগি করে নিতে পারবেন। আরো অনেক সুবিধের একটা হলো, টেপ বিনিময়। অন্যের রেকর্ড করা টেপ থেকেও পুরোপুরি ফায়দা পাবেন আপনি, যদিও নিজের গলা শুনতে পেলে সামান্য একটু বিশেষ সুবিধে পাওয়া যায়।

দ্রুত শেখা আর তিন আঙুল পদ্ধতি, সময় বাঁচাবার জুড়ি নেই এদের। এই দুটো ব্যবহার করে আশ্চর্য, চমকপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ এগুলো ব্যবহার করে যার যার পেশায় এবং জীবনে উন্নতি করছে। বিক্রি (বিশেষ করে বীমা পলিসি), প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া, শিক্ষাদান, আইন এবং অভিনয়, এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ফল পাওয়া গেছে।

দ্রুত শেখা আর তিন আঙুল পদ্ধতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে সবচেয়ে বেশি উপকারে লাগে। সেজন্যেই আমেরিকার চব্বিশটা কলেজ-ইউনিভার্সিটি, ষোলোটা হাইস্কুল আর বারটা গ্রেড স্কুলে এই পদ্ধতি শেখানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

পাঁচ

আয় ঘুম

ঘুমাই আমরা সবাই। কিন্তু ঘুম নিয়ে সমস্যারও অন্ত নেই। কেউ কেউ অভিযোগ করে, তারা ঘুমায় বটে, কিন্তু তাদের ঘুম যথেষ্ট গভীর হয় না। ফলে ঘুম থেকে জাগার পর যে ঝরঝরে, তাজা ভাবটা আসা দরকার তা আসে না; শরীর ম্যাজম্যাজ করে, ব্যথা করে, বিগড়ে থাকে মেজাজ, কাজে মন বসে না, দুর্বল লাগে ইত্যাদি। কারো কারো অভিযোগ, তাদের ঘুম খুব ছোটো, যথেষ্ট লম্বা নয়। ভোর হতে তখনো তিন ঘন্টা বাকি, ভেঙে গেল ঘুম, কি জ্বালাতন! আবার ঘুম কাতুরে লোকেরও অভাব নেই। ক্লাসে বসে, পিকনিকে গিয়ে, বাসে উঠে, রিক্সায় চড়ে, অফিসে পৌঁছে···মোট কথা জায়গা বা পরিবেশের কোনো বাছ বিচার নেই, সুযোগ থাক বা না থাক, দু'চোখ ভরা ঘুম এসে

তাদেরকে ঘায়েল করে ফেলে। উল্টোটাও ঘটে, বিছানায় শুয়ে ছটফট করে কিছু লোক, জপ করে আয় ঘুম, ঘুম আয় বলে—এরা অনিদ্রায় ভুগছে। এগুলোই সব নয়, ঘুম নিয়ে আরো অনেক সমস্যা আছে।

আলফা লেভেলে পৌঁছে নিজেকে সাজেশন দেয়ার নিয়ম আপনার জানা আছে। ঘুম নিয়ে আপনার যদি কোনো সমস্যা থাকে, সমাধান-মূলক সাজেশন দিয়ে সে সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন আপনি। হাতে আরো উপায় আছে আপনার,-মনের পর্দায় সমস্যা এবং সমাধানের ছবি দেখলেও উপকার পাবেন। যার ঘুম কম হয় তিনি প্রথমে দেখবেন রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে গেল, এই ছবি আপনি মাত্র একবার দেখবেন। ছবি-টাকে ডান দিকে সরিয়ে দিয়ে বাঁ দিক থেকে আরেকটা ছবি আনবেন পর্দায়, এই ছবিতে সমস্যার সমাধান থাকবে—ছবিতে দেখবেন, আপনি ঘুমাচ্ছেন, চারদিকে নানা গোলমাল এবং শব্দ হচ্ছে তবু আপনার ঘুম ভাঙছে না। এভাবে যার যা সমস্যা, সমস্যা অনুসারে সমাধান তৈরি করে নিয়ে পর্দায় ছবি দেখতে পারেন। ছবি দেখার সাথে সাথে তিন আঙুল পদ্ধতিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

এবার ঘুমের প্যাটার্ন সম্পর্কে সাধারণ একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করবো। স্বাভাবিক ঘুম কাকে বলে সেটা জানা থাকলে অনেক অকারণ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তারপর আসবে ঘুম গভীর করার অনুশীলন।

ঘুমের গভীরতা পরিমাপ করার একটা মাধ্যম হলো ঘুম সাইকেল। একটা ঢেউ, ওঠানামা করতে করতে ঘুমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে এগিয়ে যায়। শুরুতে এই ঢেউ নিচের দিকে মুখ করে এগোয়, তারমানে তখন আমরা ডেলটা লেভেলে নেমে যাই। তারপর যতোই এগোতে থাকে ঢেউটা ততোই নিচের দিকে নামার প্রবণতা কমে আসে। এটাই স্বাভাবিক গতি এবং প্রবণতা। এই প্যাটার্ন যদি বদলে যায় তাহলে মনে করতে হবে বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটছে। তাই স্বাভাবিক ঘুম বজায় রাখা এবং সেটাকে আরো গভীর করা আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সেটা নিচের এই পদ্ধতির সাহায্যে সম্ভব করে তোলা যেতে পারে।

স্লিপ কন্ট্রোল বা ঘুম নিয়ন্ত্রণ একটা ফর্মূলা-টাইপ টেকনিক, এর সাহায্যে স্বাভাবিক, সাধারণ, সাইকোলজিক্যাল ঘুম যে-কোনো সময়, যে-কোনো জায়গায় ওষুধ ছাড়াই নিয়ে আসা যায়।

যখনই আপনি ঘুম নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবেন, তিন—এক পদ্ধতি ব্যবহার করে বেসিক লেভেলে পৌঁছান। বেসিক লেভেল থেকে আরো গভীরে চলে যাবার কৌশল আপনার জানা আছে, ইচ্ছে করলে সেখানেও চলে যেতে পারেন। এবার পর্দায় একটা ব্ল্যাকবোর্ড দেখুন। মনে মনে কল্পনা করুন, আপনার হাতে একটা চক আর একটা ডাস্টার রয়েছে।

এরপর ব্ল্যাক-বোর্ডে একটা বড়সড় বৃত্ত আঁকুন। বৃত্তের ভেতর চক দিয়ে তৈরি করুন একটা গুণন বা ক্রস-চিহ্ন। তারপর হাতের ডাস্টার দিয়ে ক্রস-চিহ্নটাকে মুছে ফেলুন—মুছতে শুরু করবেন মাঝখান থেকে, কোনোভাবেই যেন বৃত্তের গায়ে ডাস্টারের ছোঁয়া না লাগে।

বৃত্তের ভেতর ক্রস–চিহ্ন মুছে ফেলার পর, বৃত্তের বাইরে এবং ডান দিকে ইংরেজিতে লিখুন ডীপার বা বাংলায় 'লিখুন আরো গভীর'।

এবার বৃত্তের ভেতর লিখুন ১০০। ডাস্টার দিয়ে সেটা মুছে ফেলুন—মুছতে শুরু করবেন মাঝখান থেকে যাতে বৃত্ত–রেখা এতোটুকুও মুছে না যায়।

বৃত্তের ভেতর ১০০ সংখ্যাটি মুছে ফেলার পর, বৃত্তের বাইরে এবং ডান দিকে লিখে রাখা 'ডীপার' বা 'আরো গভীর' লেখার ওপর চক বুলান।

এবার বৃত্তের ভেতর লিখুন ৯৯। একই ভাবে সেটা মুছে ফেলুন। তারপর ডীপার বা আরো গভীরের ওপর চক বুলান।

এভাবে ৯৮, ৯৭, ৯৬, ৯৫, ৯৪, ৯৩ নিচের দিকে নামতে থাকুন, যতোক্ষণ না ঘুম আসে।

সময় মতো ঘুম ভাঙে না, এটাও অনেকের জন্যে সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। যারা এই সমস্যায় ভুগছেন, নিচের এই অনুশীলন চর্চা করতে পারেন, ভাল ফল পাবেন। ঘড়ির অ্যালার্ম বাজবে না, তবু ঠিক যখন চান তখনই ঘুম থেকে জাগতে পারবেন।

ঠিক ঘুমাতে যাবার আগে তিন–এক পদ্ধতির সাহায্যে বেসিক লেভেলে পৌছান।

তারপর আরো গভীর লেভেলে পৌছে মনের পর্দায় একটা ঘড়ি দেখুন। মনে মনে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে নির্দিষ্ট একটা ঘরে নিয়ে আসুন, ঠিক যে সংখ্যার ঘরে কাঁটা উপস্থিত হলে ঘুম থেকে জগতে চান আপনি। এরপর নিজেকে বলুন, 'এই সময়ে ঘুম থেকে জাগতে চাই আমি, আর ঠিক এই সময়েই ঘুম থেকে আমি জাগবো।' দেখবেন ঠিকই ভাঙছে ঘুম।

অনেক সময় জেগে থাকা জরুরী দরকার হয়ে পড়ে। কাল পরীক্ষা, রাত জেগে পড়া দরকার। কিংবা সময় ধরে রোগীকে ওষুধ খাওয়াতে হবে, কোনোমতেই ঘুমিয়ে পড়া চলবে না। অথবা কোথাও সময় মতো পৌছুতে হলে অনেক রাত পর্যন্ত গাড়ি চালাতে হবে, ঘুমিয়ে পড়লে সর্বনাশ। এই ধরনের অনেক কারণেই অনেক সময় জেগে থাকা দরকার হয়।

সাধারণ একটা ধারণা হলো, রাত জাগলে শরীরের ক্ষতি হয়। ক্ষতি যে হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্ষতিটা হয় ব্রেনের অনুমতি না দিয়ে রাত জাগা হলে। আমরা জানি, ব্রেনই আমাদের শরীরকে এনার্জি বা শক্তি বরাদ্দ করে। জেগে থাকার জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ এনার্জি বরাদ্দ করা হয়, এই বরাদ্দ বাড়াতে হলে ব্রেনকে অনুরোধ করতে হবে। এই অনুরোধ জানাবার আনুষ্ঠানিক নিয়ম আছে, সেটা পালন করলে রাত জাগার জন্যে অতিরিক্ত যে এনার্জিটুকু আমাদের দরকার তা পাওয়া যাবে। তাহলেই রাত জাগলে বা বেশিক্ষণ জেগে থাকলে শরীরের ক্ষতি হবে না। এবার অনুশীলন।

যখনই তন্দ্রার ভাব বা ঘুম আসতে চাইবে, বিশেষ করে আপনি যখন গাড়ি চালাচ্ছেন, রাস্তার একধারে গাড়ি থামিয়ে স্টার্ট বন্ধ করুন, তিন–এক পদ্ধতির সাহায্যে বেসিক বা আরো গভীর লেভেলে চলে যান।

নিজের লেভেলে পৌছে মনে মনে নিজেকে বলুন, 'আমার ঘুম পাচ্ছে; কিন্তু আমি ঘুমাতে চাই না; আমি সম্পূর্ণ সজাগভাবে জেগে থাকতে চাই, জেগে থাকা অবস্থায়

পুরোপুরি সুস্থ এবং ঝরঝরে তাজা থাকতে চাই।'

তারপর নিজেকে মনে মনে বলুন, 'এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুণতে যাচ্ছি আমি। পাঁচ পর্যন্ত গুণে চোখ খুলবো, সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় জেগে থাকবো, পুরোপুরি সুস্থ এবং ঝরঝরে তাজা থাকবো। ঘুমঘুম ভাব থাকবে না। সম্পূর্ণ সচেতনভাবে টনটনে জ্ঞান নিয়ে জেগে থাকতে পারবো আমি।'

মনে মনে গুণতে শুরু করুন, ধীরে ধীরে—১, ২, ৩। তিন পর্যন্ত গুণে নিজেকে আবার স্মরণ করিয়ে দিন, 'পাঁচ পর্যন্ত গুণে চোখ খুলবো, সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় জেগে থাকবো, ঝরঝরে আর তাজা থাকবো। ঘুম ঘুম ভাব একটুও থাকবে না, সম্পূর্ণ সচেতনভাবে, টনটনে জ্ঞান নিয়ে জেগে থাকতে পারবো আমি।'

এরপর মনে মনে গুণুন, ৪,৫। পাঁচ পর্যন্ত গুণে, চোখ খুলুন। নিজেকে মনে মনে বলুন, 'আমি সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় জেগে আছি, শরীরটা আগের চেয়ে ভালো, তাজা আর ঝরঝরে লাগছে।'

ছয়

স্বপ্নের দেশে

সত্যিকার অর্থে মুক্ত যদি কখনো থাকি আমরা তো সে স্বপ্নে। সময়ের বেড়া, মহাশূন্যের সীমানা, যুক্তির গণ্ডি, বিবেকের বাধানিষেধ সব মিলিয়ে যায়, আমরা আমাদের নিজেদের সৃষ্টি অদ্ভুত এক জগতের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারি। স্বপ্নে আমরা যা তৈরি করি, তা একান্ত ভাবেই আমাদের। স্বপ্নকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিচার করেছেন ফ্রয়েড। তিনি অনেকটা এই রকম বলেছেনঃ একজন লোকের স্বপ্নকে বোঝো, তাহলে লোকটাকেও বুঝতে পারবে।

মনের নিয়ন্ত্রণ শিখতে গিয়ে স্বপ্নকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিচ্ছি, কিন্তু আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে, কারণ আমরা আমাদের মনটাকে সম্পূর্ণ অন্য এক ভাবে ব্যবহার করতে শিখছি। কোনো চেষ্টা ছাড়াই যে-স্বপ্ন দেখে মানুষ, ফ্রয়েড সে-ধরনের স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। মনের নিয়ন্ত্রণ তাঁর গবেষণার বিষয় ছিলো না। কিন্তু আমরা বিশেষ ধরনের কিছু সমস্যা সমাধানের জন্যে নিজেদের তৈরি করা স্বপ্নকে ব্যবহার করতে চাইছি। স্বপ্নের বিষয়বস্তু কি হবে তা আমরা আগে থেকেই নির্ধারণ করে নেবো বলে, স্বপ্নের ব্যাখ্যাও আমরা করবো সম্পূর্ণ আলাদা এক নিয়মে, ফ্রয়েডীয় নিয়ম সেখানে কোনো কাজে আসবে না। নিজেদের তৈরি করা স্বপ্নের ব্যাখ্যা

থেকে বেরিয়ে আসবে আমাদের সমস্যার সমাধান। এর ফলে যদিও চেষ্টা-ছাড়া-স্বপ্ন সংখ্যার দিক থেকে কমে যাবে, কিন্তু বিনিময়ে লাভ করবো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটা স্বাধীনতা, সেই সাথে জীবনের ওপর আরো শক্ত এবং সুষ্ঠু হবে আমাদের নিয়ন্ত্রণ।

স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণ করার তিনটে নিয়ম শিখবেন আপনি। প্রতিটি নিয়ম শেখার জন্যে ধ্যানমগ্ন হতে হবে।

স্বপ্ন মনে করতে না পারা একটা সমস্যা, প্রায় সবারই এই সমস্যা আছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে কি স্বপ্ন দেখেছি তা আর মনে করতে পারি না। তাই কি করলে স্বপ্ন মনে থাকবে সেটাই আগে শেখা যাক।

প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায়, 'স্বপ্ন আমি একেবারেই দেখি না।' কথাটা ঠিক নয়। স্বপ্ন আমরা সবাই দেখি, হয়ত মনে রাখতে পারি না। কোনো ভাবে যদি স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে দেয়া যায়, কয়েক দিনের মধ্যেই আপনি মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলবেন।

স্বপ্ন সম্পর্কে হোসে সিলভার কিছু বক্তব্য আছে, প্রথমে তাঁর ভাষাতেই সেটা শোনা যাক।

'উনিশ শো উনপঞ্চাশের দিকে যখন স্বপ্ন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলাম, আমার কোনো ধারণাই ছিলো না। শেষ পর্যন্ত কি আবিষ্কার করবো, বা কি ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছুবো। স্বপ্নকে গঠনমূলক কাজে লাগানো যায় কিনা, সেটাই ছিলো আমার জানার আর গবেষণার বিষয়। স্বপ্নের বৈচিত্র্য সম্পর্কে অনেক গল্পই শোনা ছিলো আমার। সীজার, আমরা জানি, আশ্চর্য একটা অর্থপূর্ণ স্বপ্ন দেখেছিলেন পনেরোই মার্চ সম্পর্কে। স্বপ্নে সাবধান করে দেয়া হয়েছিলো তাঁকে। ওই তারিখেই নিহত হন তিনি। নিজের নিহত হওয়া সংক্রান্ত স্বপ্ন লিংকনও দেখেছিলেন। জানতাম, এই ধরনের স্বপ্ন যদি স্রেফ দুর্লভ অ্যাকসিডেন্ট হয়, তাহলে আমার পরিশ্রম বৃথাই যাবে।

'এক সময় আমার দৃঢ় ধারণা হলো, আসলে আমি বৃথাই সময় নষ্ট করছি। দশ বছর ধরে ফ্রয়েড, অ্যাডলার আর ইয়াং-এর রচনা পড়ছিলাম—মনে হতে লাগলো যতোই পড়ছি ততোই কম জানছি। একদিনের এক ঘটনা। রাত তখন দুটো। হাতের বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিছানায় গিয়ে উঠলাম। ঠিক করলাম, অনেক হয়েছে, অযথা আর সময় নষ্ট করবো না। এসব বই আজেবাজে লোকেরা লেখেননি, এঁরা প্রত্যেকে এক একজন মহাপণ্ডিত। অথচ একটা বিষয়েও তাঁরা নিজেদের মধ্যে একমত হতে পারছেন না!

'এর ঘন্টা দুয়েক পর একটা স্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আর-সব স্বপ্নের মতো কয়েকটা ঘটনার সমষ্টি নয় ওটা, স্রেফ একটা আলো। আমি শুধু দুপুরবেলার প্রখর, সোনালি, উজ্জ্বল রোদ দেখতে পেলাম। চোখ খুললাম, ঘরটা অন্ধকার। চোখ বন্ধ করলাম, আবার সেই আলো। এভাবে কয়েক বার চোখ খুললাম আর বন্ধ করলাম। চোখ খুললে অন্ধকার, বন্ধ করলে আলো। তিন কি চার বার এই রকম করার পর আবার যখন চোখ বন্ধ করলাম, তিনটে সংখ্যা দেখতে পেলাম। ৩-৪-৩। তারপর আরেক প্রস্থ সংখ্যা দেখলাম ৩-৭-৩। পরের বার প্রথম সংখ্যা তিনটে ফিরে এলো, তারপর দ্বিতীয় সংখ্যা তিনটে।

'সংখ্যার চেয়ে আলোটাই আমাকে বেশি কৌতূহলী করে তুললো। ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছিল ওটা। আমার ভয় হলো, এই আলো মিলিয়ে যাবার সাথে সাথে আমার জীবন-প্রদীপও নিভে যাবে! তারপর সাহস হলো মনে, ভাবলাম, না, তা কেন হতে যাবে, মরবো কেন! যখন বুঝলাম, মরতে যাচ্ছি না, ইচ্ছে করলাম, উজ্জ্বল আলোটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসে ওটাকে ভালো করে লক্ষ্য করবো। নড়েচড়ে শুলাম, মনের আরো গভীর লেভেলে চলে গেলাম, কিন্তু কিছুতেই কোনো লাভ হলো না। আগের মতোই ম্লান হতে থাকলো আলোটা। সব মিলিয়ে মিনিট পাঁচেক ছিলো, তারপর মিলিয়ে গেল।

'ভাবলাম, কে জানে, সংখ্যাগুলোর হয়তো একটা মানে আছে। বাকি রাতটা জেগে টেলিফোন নাম্বার, ঠিকানা, লাইসেন্স নাম্বার মনে করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু স্বপ্নে দেখা ওই সংখ্যাগুলোর সাথে মিল আছে এমন কিছু মনে পড়লো না।

'আজ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বের করার অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটা উপায় জানা আছে আমার, কিন্তু সে-সময় আমার গবেষণার একেবারে প্রথম দিকে ছিলাম আমি। সকাল বেলা খুব ক্লান্তি লাগলো, কারণ মাত্র দু'ঘন্টা ঘুমিয়েছি। বেলা বাড়তে লাগলো, কিন্তু সংখ্যা-গুলোর কথা আমি ভুলতে পারলাম না। ভাবছি আর ভাবছি, আমার জীবনের কোনো কিছুর সাথে এগুলোর কোনো মিল আছে কিনা।

'এবার তুচ্ছ কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। এই তুচ্ছ ঘটনাগুলোই আমার সেই স্বপ্ন-রহস্য ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করেছিল।

'আমার ইলেকট্রনিকসের দোকান পনেরো মিনিট পর বন্ধ হয়ে যাবে, এই সময় এক বন্ধু এসে বললো, চলো, কফি খেয়ে আসা যাক। রাজি হয়ে বললাম, একটু অপেক্ষা করো। এই সময় দোকানে এলো আমার স্ত্রী। বললো, "কফিই যখন খাবে, মেক্সিকান সাইডের ওদিকে গিয়ে খাও, ফেরার সময় আমার জন্যে খানিকটা রাবিং অ্যালকোহল নিয়ে এসো।" ব্রিজের কাছে একটা দোকান ছিলো, যেখানে ওই অ্যালকোহল সস্তায় পাওয়া যেতো।

'মেক্সিকান সাইডে যাবার পথে বন্ধুকে স্বপ্নের কথাটা বললাম। ওকে বলার সময় হঠাৎ একটা আইডিয়া এলো মাথায়—হতে পারে স্বপ্নে দেখা ওই সংখ্যাগুলো আসলে কোনো লটারির নাম্বার। আমাদের গাড়ি একটা দোকান পেরিয়ে এলো, দোকানটায় মেক্সিকান লটারির টিকেট বিক্রি হয়। দোকান বন্ধের সময় হয়ে এসেছে। দরজার খানিকটা অংশ বন্ধ হয়েও গেছে, তাই আর গাড়ি থামালাম না। ভাবলাম, থাকগে! দরকার নেই লটারির টিকেট কিনে। এ-ধরনের ছেলেমানুষির কোনো অর্থ হয় না।

'খানিক দূর এগিয়ে অ্যালকোহলের দোকানের সামনে গাড়ি থামালাম।

'অ্যালকোহলের বোতলটা কাগজে মুড়ে দিচ্ছে দোকানদার, দোকানের আরেক অংশ থেকে বন্ধু আমাকে ডাকলো। জানতে চাইলো, "তুমি যেন কি সংখ্যা খুঁজছো হে?"

'বললাম, "তিন-চার-তিন আর তিন-সাত-তিন ।"

'বন্ধু শো-কেস থেকে একটা টিকেটের অর্ধেক তুলে আমাকে দেখালো। দেখলাম, টিকেটের নম্বর ছাপা রয়েছে, তিন-চার-তিন।

'রিপাবলিক অব মেক্সিকো জুড়ে হাজার হাজার দোকানদার প্রতি মাসে প্রথম

তিনটে সংখ্যা বিশিষ্ট লটারির টিকেটের অর্ধেক অংশ পেয়ে থাকে। গোটা দেশের শুধু-মাত্র এই দোকানেই ৩৪৩ নম্বর টিকেট বিক্রি হয়। ৩৭৩ নম্বর টিকেট বিক্রি হয় মেক্সিকো সিটি-তে।

'কয়েক হপ্তা পর আমি জানলাম, জীবনে প্রথম কেনা আমার টিকেটের প্রথম অর্ধেক অংশ দশ হাজার ডলারের একটা প্রাইজ পেয়েছে। টাকাটা আমার দরকার ছিলো, সন্দেহ নেই। কিন্তু যে ঘটনার মধ্যে দিয়ে লটারি জিতলাম, সেটা আমার কাছে টাকার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলো। আমার প্রত্যয় দৃঢ় হলো, বছরের পর বছর ধরে এই যে লেখাপড়া আর গবেষণা করেছি, এসব বৃথা যাবে না। কিভাবে জানি না, তবে হাইয়ার ইন্টেলিজেন্সের সাথে আমার যোগাযোগ ঘটেছে। হতে পারে এর আগেও অনেক বার এই যোগাযোগ ঘটেছে, কিন্তু জানতে পারিনি।'

হোসে সিলভার স্বপ্নের ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা যাক।

হতাশার একটা মুহূর্তে স্বপ্নটা দেখেন তিনি। স্বপ্নের ভেতর আশ্চর্য একটা ব্যাপার ছিলো—আলো। এই আলোটা ছিলো বলেই স্বপ্নটা ঘুম ভাঙার পরও তিনি মনে করতে পেরেছিলেন। পরদিন দোকানে এলো এক বন্ধু, প্রস্তাব দিলো কফি খেতে যাওয়ার। হোসে ক্লান্ত ছিলেন, তাই যেতে রাজি হলেন। সেই মুহূর্তে তাঁর স্ত্রী এসে যদি মেক্সিকান সাইডে গিয়ে অ্যালকোহল কেনার কথা না বলতেন, ওদিক তাঁদের যাওয়াই হতো না। ছোটো ছোটো ঘটনাগুলো শেষ পর্যন্ত হোসেকে টেনে নিয়ে গেল এমন একটা দোকানে, গোটা মেক্সিকোর মধ্যে শুধু ওই দোকানেই ৩-৪-৩ নম্বরের টিকেট কিনতে পাওয়া যায়।

অনেকগুলো ছোটো ছোটো ঘটনা মিলে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটেছে, এগুলোকে কেউ যদি কাকতালীয় বলে সন্দেহ করে, সত্যি-মিথ্যে যাচাই করে দেখা সম্ভব বাকি ঘটনাগুলো সম্পর্কে কি বলার থাকবে তার? হোসে সিলভা স্বপ্ন দেখার কৌশল উদ্ভাবন করেন এবং পদ্ধতিগুলোকে উন্নত করেন, সেগুলো ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের আরো চারজন মাইণ্ড কন্ট্রোল গ্র্যাজুয়েট লটারি জিতেছেন। তাঁরা হলেন, রকফোর্ড, ইলিয়নয়েস-এর রেগিনা এম. ফরনেকার—তিন লক্ষ ডলার। শিকাগোর ডেভিড সিকিচ--তিন লক্ষ ডলার। শিকাগোর ফ্রান্সেস মরোনি—পঞ্চাশ হাজার ডলার। এবং বাফেলো, নিউইয়র্কের জন ফ্রেমিং—পঞ্চাশ হাজার ডলার।

কিছু ঘটনা যখন ঘটে, যার কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু ফলটা হয় গঠনমূলক বা উপকারী, আমরা তখন সেটাকে কোইন্সিডেন্স বলবো। কিন্তু ফল যদি হয় ধ্বংসাত্মক, সেটাকে আমরা বলি অ্যাকসিডেন্ট। এই বই পড়ে আপনি শিখবেন কোইন্সিডেন্স কিভাবে ঘটাতে হয়।

লটারি জেতার স্বপ্ন দেখার পর হোসে সিলভার বিশ্বাস জন্মায় হাইয়ার ইন্টেলিজেন্সের অস্তিত্ব আছে এবং সেই শক্তি তাঁর সাথে যোগাযোগ করার ক্ষমতাও রাখে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই পরিষ্কার হয়ে যায়, হোসে সিলভার এটা নতুন কোনো আবিষ্কার নয়। এ-কথাও সত্যি নয় যে এ ধরনের ঘটনা শুধু তাঁর জীবনে এই

প্রথম ঘটলো। জীবনের মোড় ঘোরার মুহূর্তে, চরম হতাশাগ্রস্ত বা বিপদগ্রস্ত মুহূর্তে হাজার হাজার লোক এ-ধরনের স্বপ্ন দেখেছে, যে স্বপ্ন হয় তাদেরকে বিপদ সম্পর্কে আগাম সাবধান করে দিয়েছে নয়ত সমস্যার সমাধান বাতলে দিয়েছে। এ-ধরনের স্বপ্নের কথা সকল ধর্ম-গ্রন্থেই পাওয়া যায়।

ফ্রয়েড বলেছেন, স্বপ্ন টেলিপ্যাথীর জন্যে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। পরবর্তী কালে আরো একটু এগিয়ে কোনো কোনো গবেষক বলেছেন, হাইয়ার ইন্টেলিজেন্সের কাছ থেকে তথ্য গ্রহণ করার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে স্বপ্ন।

হাইয়ার ইন্টেলিজেন্স? ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন তাঁরা?

বোঝাতে চেয়েছেন, আলোর একটা ঝলকানির মতো অন্তর্দৃষ্টি, ঠিক যখন আপনার দরকার ওটা। কিংবা, কারো স্নেহময়, শক্তিশালী উপস্থিতি। এক হাইয়ার ইন্টেলি-জেন্সের উপস্থিতি আমরা সবাই অনুভব করি, কেউ কম কেউ বেশি। তার সাহায্য এবং সান্নিধ্য কামনা করি আমরা, কিন্তু কখনোই তাকে নাগালের মধ্যে পাই না।

গবেষকদের মনে এক সময় একটা প্রশ্ন জাগলো, লোকে যেমন টেলিফোন পাবার জন্যে অস্থির ভাবে অপেক্ষা করে, আমাদের জন্যেও সেই রকম কেউ অপেক্ষা করছে কিনা? যোগাযোগ করার জন্যে আমরা কি নিজেরা উদ্যোগী হয়ে ডায়াল করতে পারি না? প্রার্থনার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সাথে যদি যোগাযোগ করা যায়, তাহলে হাইয়ার ইন্টেলিজেন্সের সাথে যোগাযোগের একটা মাধ্যম আবিষ্কার করা যাবে না কেন?

গবেষণায় দেখা গেল, একাধিক মাধ্যমের সাহায্যে হাইয়ার ইন্টেলিজেন্সের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব। তার মধ্যে একটা ড্রিম কন্ট্রোল বা স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণ। অত্যন্ত সহজ একটা পদ্ধতি, খুব সহজে শেখা যায়।

স্বপ্ন স্মরণ করার জন্যে উজ্জ্বল আলো আপনাকে সাহায্য করবে, এটা আশা করা ঠিক হবে না। তবে প্রোগ্রাম-পদ্ধতির ওপর আপনি ভরসা রাখতে পারেন। এই পদ্ধতির নিয়ম হলো, নিজেকে একটা প্রোগ্রামের আওতায় আনতে হবে, ধ্যানমগ্ন অবস্থায়।

ঘুমোতে যাবার ঠিক আগে আলফা লেভেলে চলে যান। নিজেকে সাজেশন দিন, 'আমি একটা স্বপ্ন মনে রাখতে চাই। আমি একটা স্বপ্ন মনে রাখতে পারবো।'

এবার হাতের কাছে কলম আর কাগজ নিয়ে ঘুমাতে যান। তারপর যখন ঘুম ভাঙবে, তা সে রাতেই হোক বা সকালে, যে স্বপ্নটা দেখেছেন সেটার বিবরণ লিখে ফেলুন, যতোটুকু মনে করতে পারেন। এই পদ্ধতি রাতের পর রাত চর্চা করতে থাকুন, যতো দিন যাবে ততোই বেশি স্পষ্ট মনে করতে পারবেন, এক সময় সম্পূর্ণ স্বপ্নটা মনে রাখতে কোনো অসুবিধেই হবে না। পদ্ধতিটার সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে দক্ষতা বাড়বে আপনার, তখন বুঝবেন, দ্বিতীয় নিয়মটা শেখার জন্যে তৈরি হয়েছেন আপনি।

ঘুমের আগে আলফা লেভেলে পৌঁছে মনের পর্দায় একটা সমস্যাকে জ্যান্ত করে তুলুন। ওটা এমন একটা সমস্যা হতে হবে, উপদেশ বা তথ্য পেলে যা সমাধান করা সম্ভব। তার আগে ভালো করে বুঝে দেখুন, সত্যি আপনি সমস্যাটার সমাধান চান কি না। নির্বোধ প্রশ্ন করলে উত্তর পাবেন হাস্যকর, অর্থহীন। এবার এই কথাগুলো বলে নিজেকে প্রোগ্রামের আওতায় নিয়ে আসুন। 'আমার একটা সমস্যা আছে। যে স্বপ্নটা

দেখবো তাতে এমন কিছু তথ্য এবং উপদেশ থাকবে যার সাহায্যে সমস্যাটা আমি সমাধান করতে পারবো। স্বপ্ন আমি একটা দেখবোই, তাতে সমাধানের সূত্রও থাকবে। স্বপ্নে যা বলা হবে আমি তা পরিষ্কার বুঝতে পারবো।'

রাতে বা সকালে ঘুম থেকে জেগে স্বপ্নটার অর্থ খোঁজার চেষ্টা করুন।

স্বপ্নের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা পদ্ধতির সাথে আমাদের ব্যাখ্যা পদ্ধতির পার্থক্য থাকবে, কারণ আমরা নিজেদের তৈরি করা স্বপ্ন দেখি। কাজেই আপনার যদি ফ্রয়েডীয় স্বপ্ন ব্যাখ্যা পদ্ধতির সাথে পরিচয় থাকে, সেটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করুন।

কল্পনা করুন, এই স্বপ্নটার কি অর্থ করতেন ফ্রয়েড।

নরমাংসভুক একদল আদিবাসী গভীর বনভূমির ভেতর এক ভদ্রলোককে ঘিরে ফেলেছে। তাঁর কাছে চলে আসছে তারা, তাদের হাতের বর্শা উঠছে আর নামছে, উঠছে আর নামছে। প্রতিটি বর্শার ডগায় একটা করে ফুটো রয়েছে। ঘুম ভাঙার পর ভদ্রলোক তাঁর একটা সমস্যার সমাধান হিসেবে স্বপ্নটার অর্থ করলেন। এই সমস্যাটা অনেক দিন থেকে ভোগাচ্ছে তাঁকে। একটা সেলাই মেশিনের ডিজাইন কিভাবে তৈরি করতে হবে, এই স্বপ্ন থেকে তার উত্তর পেয়ে গেলেন তিনি। স্বপ্ন দেখার আগে পর্যন্ত সূঁচটাকে ওঠা-নামা করাতে পারতেন, কিন্তু তাতে সেলাই হতো না। স্বপ্ন থেকেই তিনি শিখলেন, সূঁচের ডগায় একটা ফুটো রাখতে হবে। ভদ্রলোকের নাম ইলিয়াস হাউই, ইনিই সর্বপ্রথম কাজের উপযুক্ত সেলাই মেশিন আবিষ্কার করেছিলেন।

প্রোগ্রাম-পদ্ধতির সাহায্যে দেখা স্বপ্ন লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে।

এক জায়গায় যাবার জন্যে মটর সাইকেল নিয়ে সাত দিন বাইরে থাকতে হবে এক লোককে, রওনা হবার কয়েক দিন আগে নিজেকে প্রোগ্রামের আওতায় নিয়ে এলো সে। উদ্দেশ্য, রওনা হবার পর ভাগ্যে যদি কোনো দুর্ঘটনা থেকে থাকে, স্বপ্নটা যেন তাকে আগে থেকে সাবধান করে দেয়। এর আগে দূরে যখন কোথাও গেছে সে, ছোটোখাটো দুর্ঘটনা দু'একটা ঘটেছে, তাই এই সতর্কতা।

নিজেকে প্রোগ্রামের আওতায় নিয়ে আসার পর ঠিকই স্বপ্ন দেখলো সে। দেখলো, এক বন্ধুর বাড়িতে রয়েছে সে। ডিনারের সময় তার প্লেটে পরিবেশন করা হলো কাঁচা তরকারি-একরাশ বরবটি। অথচ অন্য সবার প্লেটে লোভনীয় সব সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।

ঘুম থেকে উঠে চিন্তায় পড়ে গেল বেচারা। কি অর্থ হতে পারে এই স্বপ্নের? পথে তাকে কাঁচা বরবটি খেতে নিষেধ করা হচ্ছে? কিন্তু এই নিষেধের কোনো মানে হয় না, কারণ রান্না করা বরবটিই পছন্দ করে না সে, কাঁচা বরবটি তো দূরের কথা। তবে কি স্বপ্নটার মানে, বন্ধুর বাড়িতে তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হবে না? না, তাও সম্ভব নয়। অনেক দিনের পুরনো বন্ধুত্ব, বন্ধু তাকে কাছে পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। তাছাড়া, এবার তার এই যাত্রার সাথে এই বন্ধু বা তার বাড়ির কোনো সম্পর্ক নেই।

দু'দিন পরের ঘটনা। নিউইয়র্কের একটা রাস্তা ধরে যাচ্ছে সে। ভোর বেলা, রাস্তায় বলতে গেলে কোনো যানবাহন নেই, একটা হাফট্রাক ছাড়া।

হাফট্রাকটা সামনে। সেটার কাছাকাছি এসে দেখলো, ট্রাকের ওপর পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে রয়েছে বরবটি ভরা বস্তা। স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যেতে ঘন্টায় পঁয়ষট্টি মাইল থেকে ঘন্টায় পঁচিশ মাইলে স্পীড নামিয়ে আনলো সে। তারপর পনেরো মাইল স্পীডে একটা বাঁক নেয়ার সময় তার মটর সাইকেলের পিছনের চাকা পিছলে গেল—বস্তা থেকে কিছু বরবটি পড়ে গেছে রাস্তায়, তার ওপর চাকা পড়তেই ঘটনাটা ঘটলো।

সাবধান ছিলো বলে সামান্য একটু আহত হলো সে। কিন্তু স্বপ্নটা যদি না দেখতো, ঘন্টায় পঁয়ষট্টি মাইল স্পীডেই মটর সাইকেল চালাতো সে। সেক্ষেত্রে কি অবস্থা হতো তার?

যে স্বপ্ন দেখবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনি, শুধু আপনিই সেটার ব্যাখ্যা করতে পারবেন। স্বপ্ন বুঝতে হলে প্রোগ্রামের আওতায় নিজেকে নিয়ে আসার সময় উপযুক্ত সাজেশন দিয়ে নিতে হবে। স্বপ্নের অর্থ অনেক সময় ধরা দিয়েও ধরা দেবে না, সেক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টির সহায়্যে অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে আপনাকে। অনেক সময় কণ্ঠস্বরহীন অবচেতন মন এই অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে থাকে।

স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণ শেখার ব্যাপারে আপনি যদি ধৈর্যের পরিচয় দেন, যদি নিয়মিত চর্চা করতে থাকেন, একদিন আপনার মনের একটা অমূল্য ভাণ্ডারের দরজা আপনার সামনে খুলে যাবে। যুক্তির বিচারে, লটারি জেতার আশা আপনি করতে পারেন না—কারণ লটারির ধর্মই হ'লো, মাত্র অল্প দু'একজন জিতবে ওটা। কিন্তু আবার একথাও তো সত্যি যে, লটারি যা দিতে পারে তারচেয়ে অনেক বেশি দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে আছে জীবন—যে-কেউ চেষ্টা করলেই পেতে পারে।

এবার, এখানে আমরা কয়েকটা অনুশীলন দেবো। এগুলো প্রতিদিন রাতে শোবার আগে চর্চা করতে হবে।

স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণঃ নিয়ম-১

স্বপ্ন মনে রাখা চর্চা করার জন্যে তিন—এক পদ্ধতির সাহায্যে নিজের লেভেলে চলে যান। ওখানে পৌঁছে, মনে মনে নিজেকে বলুন, 'আমি একটা স্বপ্ন মনে রাখতে চাই। আমি একটা স্বপ্ন মনে রাখতে পারবো।' নিজের লেভেল থেকে বেরিয়ে আসার দরকার নেই, লেভেলে থাকা অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়ুন।

সকালে বা রাতে স্বপ্নের উজ্জ্বল, পরিষ্কার স্মৃতি নিয়ে যখন ঘুম ভাঙবে, একটা কাগজে বিবরণ লিখে নিন। যখন বুঝবেন স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণঃ নিয়ম-১ ভালো কাজ দিচ্ছে, শুধু তখন দু'নম্বর নিয়ম চর্চা শুরু করবেন।

স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণঃ নিয়ম-২

ধ্যানমগ্ন অবস্থায় নিজেকে মনে মনে বলুন, 'আমার স্বপ্নগুলো আমি মনে রাখতে চাই। আমার স্বপ্নগুলো আমি মনে রাখতে পারবো।' এরপর ঘুমিয়ে পড়ুন।

রাতে কয়েকবার এবং সকালে স্বপ্নের পরিষ্কার, উজ্জ্বল স্মৃতি নিয়ে জেগে উঠবেন আপনি। আপনার স্বপ্ন-খাতায় বা কোনো প্যাডে স্বপ্নের সমস্ত বিবরণ লিখে ফেলুন। দু'নম্বর নিয়ম ভালো কাজ দিলে তিন নম্বর চর্চা শুরু করুন।

স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণঃ নিয়ম—৩

এবার শুধু স্বপ্ন মনে রাখতে নয়, সেটা বুঝতে এবং সেই সাথে আপনার সমস্যার সমাধান পাবার জন্যে নিজেকে প্রোগ্রামের আওতায় নিয়ে আসবেন আপনি। তিন—এক পদ্ধতির সাহায্যে নিজের লেভেলে চলে যান। মনে মনে নিজেকে বলুন, 'আমার একটা সমস্যা আছে। যে স্বপ্নটা দেখবো তাতে এমন কিছু তথ্য এবং উপদেশ থাকবে যার সাহায্যে সমস্যাটা আমি সমাধান করতে পারবো। একটা স্বপ্ন আমি দেখবোই, তাতে সমাধানের সূত্রও থাকবে। স্বপ্নে যা বলা হবে আমি তা পরিষ্কার বুঝতে পারবো।'

সাত

মুখের কথাই মন্ত্র

ভূমিকায় বলা হয়েছে, প্রথমবার পড়ার সময় কোনো অনুশীলন চর্চা করবেন না। কিন্তু নিচের অনুশীলনটা সেই নিষেধের আওতায় পড়ে না, এটা আপনি এখুনি একবার চর্চা করতে পারেন। করার সময় আপনার সমস্ত কল্পনাশক্তি ব্যবহার করবেন।

আসুন, এবার শুরু করা যাক।

কল্পনা করুন বাড়ির কিচেনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনি, হাতে একটা লেবু। লেবুটা আপনি এইমাত্র বের করেছেন রেফ্রিজারেটর থেকে, আপনার হাতের তালুতে ওটা ঠাণ্ডা লাগছে। লেবুর বাইরের দিকটা ভালো করে লক্ষ্য করুন, হলুদ মোমের মতো গা। লেবুটার দুই প্রান্তে ত্বকের রঙ বদলে গেছে, বিন্দু বিন্দু সবুজ ভাব দেখতে পাচ্ছেন আপনি। একটু চাপ দিন, আঁটসাঁট, শক্ত ভাবটুকু অনুভব করুন, অনুভব করুন ওজনটুকু।

এবার নাকের কাছে তুলে লেবুটার গন্ধ নিন। লেবুর মতো গন্ধ আর কিছুর নয়, তাই না? এবার লেবুটাকে মাঝখানে কেটে দু'ভাগ করুন, তারপর একভাগের ঘ্রাণ নিন। গন্ধটা এখন তীব্র। এবার দু'সারি দাঁতের মাঝখানে নিয়ে টুকরোটাকে গভীর ভাবে একটা কামড় বসান, রসটুকু ছড়িয়ে দিন আপনার মুখের ভেতর সবখানে। লেবুর মতো স্বাদ আর কিছুর নয়, কি বলেন?

এ পর্যন্ত এসে, আপনি যদি আপনার কল্পনা শক্তিকে ঠিকমতো ব্যবহার করে থাকেন, নিশ্চয়ই আপনার জিভে পানি এসে গেছে।

আসুন, এবার এই ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যাক।

শব্দ, নিছক শব্দ, আপনার স্যালিভারি গ্ল্যাণ্ডকে সচল করে তোলে। শব্দগুলো এমন কি বাস্তবকেও প্রতিফলিত করেনি, আপনি একটা কিছু কল্পনা করেছিলেন, সেই কল্পনাটাকে প্রতিফলিত করেছে। লেবু সম্পর্কে শব্দগুলো আপনি যখন পড়ছিলেন, সেই মুহূর্তে আপনি আসলে আপনার ব্রেনকে বলছিলেন, আপনার কাছে একটা লেবু আছে। যদিও আসলে ছিলো না, ঠিক আছে বলে বোঝাতেও চাননি আপনি। কিন্তু আপনার ব্রেন ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নেয়, স্যালিভারি গ্ল্যাণ্ডকে বলে, 'লোকটা একটা লেবুতে কামড় দিচ্ছে! জলদি, ধুয়ে অ্যাসিড সাফ করে ফেলো।' গ্ল্যাণ্ড নির্দেশটা পালন করেছে।

আমরা সবাই জানি, আমাদের ব্যবহার করা শব্দগুলো অর্থ প্রতিফলিত করে, এবং এই অর্থ খারাপ বা ভালো, সত্যি বা মিথ্যে, শক্তিশালী বা দুর্বল হতে পারে। সত্যি তাই, কিন্তু সত্যের এটা অর্ধেক মাত্র। শব্দ শুধু বাস্তবকে প্রতিফলিত করে না, তারা বাস্তবতা তৈরিও করে—যেমন মুখের লালা।

ব্রেন যে শুধু আমাদের ইচ্ছা আর উদ্দেশ্যের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিতে পারে তাই নয়, তথ্য সংগ্রহ করে নিজের ভাঁড়ারে জমাও রাখতে পারে সে, সেই সাথে আমাদের শরীরের নিয়ন্ত্রণ ভারও নিজের হাতে রেখেছে। তাকে যদি, 'আমি এখন একটা লেবু খেতে যাচ্ছি,' বা এই ধরনের কিছু বলা হয়, অমনি কাজ শুরু করে দেয় সে।

এবার মনের ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করার কাজে নেমে পড়া উচিত আমাদের। এর জন্যে কোনো অনুশীলন নেই, ব্রেনকে চালু করে দেয়ার জন্যে কি ধরনের শব্দ আমরা ব্যবহার করবো শুধু সে ব্যাপারে সতর্ক থাকলেই হবে।

এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই যে অনুশীলনটা চর্চা করলেন ওটাকে নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ বলা যেতে পারে—শারীরিক ভাবে ভালো বা মন্দ কিছুই ঘটেনি। কিন্তু শব্দকে অতো নিরীহ মনে করার কোনো কারণ নেই। আমাদের ব্যবহার করা শব্দের যেমন উপকার করার ক্ষমতা আছে তেমনি ক্ষতি করার ক্ষমতাও আছে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে কেউ হয়তো বললো, 'চা তো নয়, যেন কানা চোখের পানি।' চা খুব পাতলা হয়েছে, রঙ হয়নি, তাই এ-কথা বলা। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই কথাগুলোর ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু দেখা গেল, যারা চা খাচ্ছিলো তাদের মধ্যে একজন চায়ের কাপে চুমুক দিতে পারলো না, বা ইতিমধ্যে দিয়ে থাকলে তার মধ্যে বমি বমি একটা ভাব জাগলো। এ থেকে কি প্রমাণ হয় না, শব্দ ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে? খেতে বসে ছোটো ছেলেরা প্রায়ই একটা খেলা খেলে। খাবার জিনিসকে তারা দুর্গন্ধময় বা দেখতে কুৎসিত কোনো জিনিসের সাথে তুলনা করে। মাখন হয়ে যায় হলুদ মল, ভাত হয়ে যায় নর্দমার পোকা, ইত্যাদি। কিন্তু ভালো একটা খাবারকে মল বা নর্দমার কীট বলে ভান করা সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই দেখা যায়, কিছু না খেয়েই দু'একজন উঠে গেল।

আমরা বড়রাও এই খেলা খেলছি বৈকি। জীবনের প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ সেটা আমরা অনেকেই নেতিবাচক বা না-সূচক চিন্তা আর কথা ব্যবহার করে হারিয়ে ফেলছি। হ্যাঁ-সূচক কথার মতোই না-সূচক কথারও ধার এবং ক্ষমতা আছে, না-সূচক কথা বার বার ব্যবহার করে সেই ধার ও ক্ষমতা আমরা আরো বাড়িয়ে তুলি। ফলে জীবনের কাছ থেকে চেয়ে পাবার মতো কিছুই থাকে না।

'কেমন আছো?'

'আমাদের আর থাকাথাকি! দিন কেটে যাচ্ছে এই আর কি।'

কিংবা, 'ভালো না।' অথবা, 'বেঁচে আছি সে তো দেখতেই পাচ্ছো!'

এই ধরনের কথায় কিভাবে সাড়া দেয় আমাদের ব্রেন?

হয়তো মাথাব্যথা কোনমতে ছাড়তে চায় না। ঘাড়ে ব্যথা পাই। আবহাওয়া বদলের সাথে সাথে অসুস্থ হয়ে পড়ি। সর্দিটা ভালো হতে চায় না। তবে জেনে রাখা ভালো যে ডাক্তার আর ওষুধের পিছনে যতো টাকা আমরা খরচ করি, তার একটা মোটা অংশ খরচ করাবার 'কৃতিত্ব' আমাদের ব্যবহার করা কথাবার্তার। জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যদি ইতিবাচক বা হ্যাঁ-সূচক না হয়, আমাদের ব্রেনও নেতিবাচক বা না-সূচক ভূমিকা পালন করে। সে বলে, 'এই লোক মাথায় ব্যথা চাইছে। ঠিক আছে। ওকে দেয়া হচ্ছে মাথাব্যথা।'

ক্ষতিকর কিছু বললেই সাথে সাথে ব্যথা পাই না আমরা, ক্ষতিটাও তখুনি ঘটে না। শরীরের স্বাভাবিক প্রবণতা সুস্থ থাকা, তার সমস্ত আচরণ আর নিজস্ব গতিধারা সুস্থতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কাজ করছে। রোগ আর অসুস্থতাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও তার যথেষ্ট। কিন্তু এই প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় যখন আমরা ক্ষতিকর শব্দ ব্যবহার করে সেই ক্ষমতার গায়ে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ি। একটা সময় আসে, আমরা যা চাই শরীরকে দিয়ে ঠিক সেটাই আদায় করিয়ে নিতে পারে ব্রেন।

দুটো জিনিস আমাদের ব্যবহার করা শব্দ বা কথার ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। এক, আমাদের মনের লেভেল। দুই, আমরা যা বলি তাতে আমাদের ভাবাবেগের মাত্রা।

'ইস, প্রচণ্ড ব্যথা লাগছে!' সত্যি যদি প্রচণ্ড ব্যথা না-ও লাগে কথাটা আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে বলা হলে প্রচণ্ড ব্যথা সত্যি সত্যি অনুভব করবেন আপনি। 'গুছিয়ে কোনো কাজ করবো, তার কোনো উপায় নেই এখানে!' গভীর বিশ্বাসের সাথে কথাটা বলা হলে পরিবেশ সত্যি সত্যি বৈরি হয়ে উঠবে, যেখানে গুছিয়ে কাজ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

ফ্রান্সের এমিল কুয়ে একটা সাজেশন তৈরি করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। 'ডে বাই ডে, ইন এভরি ওয়ে, আই অ্যাম গেটিং বেটার অ্যাণ্ড বেটার।' হাজার হাজার লোকের গুরুতর অসুখ সারিয়ে দিয়েছে এই শব্দ ক'টা। ড. কুয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলছি, এই বাক্যটির জন্যে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁর সেলফ-মাস্টারী থ্রু অটোসাজেশন বইটি অমূল্য জ্ঞান দিয়েছে আমাকে।

একজন কেমিস্ট হিসেবে প্রায় ত্রিশ বছর কাজ করেছেন ড. কুয়ে। সম্মোহন নিয়ে পড়াশোনা এবং গবেষণা করার পর তিনি নিজেই একটা সাইকো-থেরাপি উদ্ভাবন করেন, যার ভিত্তি হলো অটোসাজেশন। ইংরেজি উনিশ শো দশ সালে ন্যান্সিতে তিনি একটা ফ্রি ক্লিনিক খোলেন, যেখানে তিনি সফলতার সাথে হাজার হাজার লোকের চিকিৎসা করেছেন। তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে ভালো হয়েছে বাত, ভয়ঙ্কর জাতের মাথাব্যথা, হাঁপানি, হাত বা পায়ের প্যারালাইসিস, তোতলামি, টিউমার, আলসার ইত্যাদি। কিন্তু এ-ব্যাপারে তাঁর নিজের বক্তব্য ছিলো, তিনি কাউকে সুস্থ

করেননি, শুধু মানুষকে শিখিয়েছেন নিজেদের কিভাবে সুস্থ করে তুলতে হয়। রোগ যে সারতো সেটা কোনো গল্প-কথা নয়, বাস্তব প্রমাণ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় উনিশ শো ছাব্বিশ সালে তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে পদ্ধতিটিও হারিয়ে যায়। তাঁর এই পদ্ধতি যদি অত্যন্ত জটিল আর কঠিন হতো, এবং ফলে মাত্র অল্প দু'একজন বিশেষজ্ঞ চর্চা করার জন্যে শিখতে পারতো তাহলে আজও হয়তো টিকে থাকতো সেটা। পদ্ধতিটা একেবারে সহজ। যে-কেউ শিখতে পারে, তাই অতটা মূল্য পায়নি ওটা কারও কাছে।

মাত্র দুটি মৌলিক বিধির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে পদ্ধতিটি।

১। একবারে মাত্র একটি বিষয়ে চিন্তা করতে পারি আমরা, এবং

২। আমরা যখন কোনো চিন্তার ওপর গভীর মনোযোগ আরোপ করি, তখন চিন্তাটা সত্যি হয়ে ওঠে, কারণ আমাদের শরীর-মন সেটাকে অ্যাকশন বা তৎপরতায় রূপান্তরিত করে।

কাজেই আপনি যদি ভেতরের মেশিন চালু করে শরীর বা মনকে সুস্থ করে তুলতে চান, যেটা হয়তো না-সূচক চিন্তা-ভাবনার (সচেতন বা অবচেতন) দরুন অচল হয়ে পড়ে আছে, তাহলে পর পর ত্রিশ বার এই বাক্যটি আওড়ান-'প্রতিদিন সবদিক থেকে উন্নতি করছি। সকাল-বিকেল, ছন্দ মিলিয়ে বলতে থাকুন ত্রিশবার করে, তাহলেই জানবেন ড. কুয়ের পদ্ধতি ব্যবহার করছেন আপনি।

আগেই বলেছি, ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শব্দের ক্ষমতা অনেক গুণ বেড়ে যায়। তাই আলফা বা থিটা লেভেলে পৌঁছে এই সাজেশনটা প্রতিদিন একবার দিলেও পারেন। কিন্তু এই সাজেশনের সাথে আরো ক'টা শব্দ যোগ করবেন, 'না-সূচক চিন্তা, না-সূচক সাজেশন আমার মনের কোনো লেভেলেই কোনো প্রভাব ফেলে না।'

শুধু এই বাক্য দুটোই বেশ অনেকগুলো ফল দিতে পারে। এখানে একজন মার্কিন সৈনিকের কথা উল্লেখ করবো। হোসে সিলভার ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি হয়েছিল সে, কিন্তু একদিনের বেশি ক্লাস করার সুযোগ পায়নি, হঠাৎ নির্দেশ পেয়ে তাকে চলে যেতে হয় ইন্দো-চীনে। তার শুধু মনে ছিলো কিভাবে ধ্যান করতে হয়, আর এই বাক্য দুটো।

ইন্দো-চীনে একজন পাজি সার্জেন্টের অধীনে কাজ করতে দেয়া হলো তাকে। ভয়ঙ্কর বদ-মেজাজী, মদ্যপ সার্জেন্ট; দুর্বল কাউকে পেলে তার ওপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে দেয়। মনের সাধ মিটিয়ে অত্যাচার চালাবার জন্যে নতুন আসা এই সৈনিকটিকেই বেছে নিলো সে।

দু'এক হপ্তা কাটতেই দেখা গেল, কাশতে কাশতে রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে যায় সৈনিকটির। কয়েক দিন পর, যা কোনোদিন ছিলো না, সেই হাঁপানিতে আক্রান্ত হলো সে। ডাক্তাররা তাকে অত্যন্ত যত্নের সাথে পরীক্ষা করে রায় দিলো, শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ। ইতিমধ্যে আরো নানা রকম অসুস্থতা ছেঁকে ধরলো তাকে। কাজে মন বসে না, শরীর দুর্বল লাগে। কোনো কাজ দিলে লেজেগোবরে করে ফেলে। তার অবস্থার যতো অবনতি হচ্ছে, সার্জেন্টের ভয়ঙ্কর মনোযোগও তার ওপর সেই পরিমাণে বাড়ছে।

তার ইউনিটের আর সবাই ড্রাগসের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। কিন্তু সৈনিকটি আশ্রয় নিলো সেই দুটো বাক্যের। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, রোজ তিনবার ধ্যানমগ্ন হবার সুযোগ পেতো সে। ফলাফল? তার নিজের ভাষায় শুনুন, 'মাত্র তিন দিনের মধ্যে

সার্জেন্টের অত্যাচার থেকে বেঁচে গেলাম আমি। আমাকে যা করতে বলতো সব আমি করতাম, কিন্তু তার খোঁচা মারা একটা কথাও আমাকে স্পর্শ করতো না। হাঁপানি আর সর্দি-কাশি সারতে এক হপ্তাও লাগেনি।'

মনের যে ক'টা লেভেলে আমরা মন-নিয়ন্ত্রণ চর্চা করি, শব্দ তার চেয়েও গভীর লেভেলে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ওকলাহোমার একজন নার্স-অ্যানেসথেটিস্ট, মিসেস জিন মাব্রে তাঁর রোগীদের সাহায্য করার জন্যে এই জ্ঞানটা কাজে লাগান। অ্যানেসথেশিয়ার সাহায্যে একজন রোগীকে অজ্ঞান করার পরপরই তিনি তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে সাজেশন দিতে শুরু করেন। প্রায় সব ক্ষেত্রেই আশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে। কেউ কেউ দ্রুত সেরে উঠেছে, আবার কেউ বেঁচে গেছে প্রাণে।

একদিন একটা অপারেশনের সময়, যখন প্রচুর রক্তক্ষরণ আশা করা হচ্ছিলো, কিন্তু তার কোনো লক্ষণ নেই দেখে অবাক হয়ে গেল সার্জেন। রক্ত বেরুচ্ছে, কিন্তু তা নেহায়েতই সামান্য। ব্যাপারটা কি? জানা গেল, রোগীকে অজ্ঞান করার পর তার কানে কানে মিসেস মাব্রে বলেছেন, 'তোমার শরীরকে বলো যেন বেশি রক্ত না ফেলে।' অপারেশন চলাকালেও, প্রতি দশ মিনিট পর পর এই সাজেশন দিয়ে গেছেন তিনি।

আরেকটা অপারেশনের সময় তিনি ফিসফিস করে বলেছিলেন, 'তুমি জেগে উঠে অনুভব করবে, তোমার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই তোমাকে ভালোবাসে, নিজের ওপরও তোমার ভালোবাসা জন্মাবে।' এই রোগিনী তার সার্জেনকে বিশেষ উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। সারাক্ষণ উত্তেজিত হয়ে থাকতো মহিলা, যে-কোনো ব্যথাই অমঙ্গল ডেকে নিয়ে আসবে বলে ভয় পেতো। এই প্রবণতার ফলে সেরে উঠতে প্রচুর সময় লেগে যাবে। কিন্তু জ্ঞান ফিরে এলে দেখা গেল তার চেহারায় নতুন একটা ভাব। এর তিন মাস পর সার্জেন মিসেস মাব্রেকে জানালেন, তাঁর সেই সদা উত্তেজিত রোগিনী সম্পূর্ণ বদলে গেছে। অপারেশনের ধকল খুব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠেছে সে, শুধু তাই নয়, জীবনের প্রতি নতুন আকর্ষণ ও বিশ্বাস জন্মেছে তার, অস্থিরতা কেটে গিয়ে তার মধ্যে এসেছে শান্ত একটা ভাব।

মিসেস মাব্রের কাজগুলো থেকে তিনটে ছবি পাই আমরা। এক, মনের গভীর স্তরে শব্দ বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বা বিশেষ তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। দুই, যতোটুকু ধারণা করা হয় শরীরের ওপর তারচেয়ে অনেক বেশি কর্তৃত্ব রয়েছে মনের। তিন, আগেই অবশ্য কথাটা বলা হয়েছে—আসলে আমরা অচেতন হই না, সব সময় সচেতন থাকি।

ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক মা-বাবাই চিন্তা করেন, এই ছেলেকে মানুষ করবো কিভাবে! লেখাপড়ায় মন নেই, সারাদিন শুধু ভাই-বোনদের সাথে ঝগড়া-ঝাঁটি, ডানপিটের একশেষ, কারো কোনো শাসনই মানে না।

এসব ভেবে উদ্বিগ্ন হওয়ার চেয়ে যদি ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে ফিসফিস করে কিছু উপদেশ, সাজেশন ইত্যাদি দেয়া হয়, আশ্চর্য ফল পাওয়া যেতে পারে।

আট

কল্পনার শক্তি

ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে মুক্ত হওয়ার সহজ একটা উপায় আছে—সেটা হলো কল্পনা। কল্পনা খপ্ করে লক্ষ্যবস্তু ধরে ফেলে। যা চায় তাই পায় সে।

কল্পনা আমাদের জন্যে একটা অত্যন্ত কাজের, দরকারী হাতিয়ার। এর কাছ থেকে উপকার পাবার কোনো শেষ সীমা নেই। সেজন্যেই এই বইয়ের প্রথম দিকে বার বার করে বলা হয়েছে, গভীর স্তরে পৌঁছে মনের পর্দায় জ্যান্ত ছবি দেখাটা আপনাকে ভালো করে শিখে নিতে হবে। আপনি যদি বিশ্বাস, বাসনা আর প্রত্যাশা দিয়ে কল্পনাকে উজ্জীবিত করতে পারেন, এবং উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য চাক্ষুষ করার কাজে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারেন, যার ফলে উদ্দেশ্য আর লক্ষ্যগুলো আপনি দেখতে, অনুভব করতে, শুনতে, স্বাদ নিতে এবং এমন কি প্রায় ছুঁতে পারবেন, তাহলে জীবনের কাছ থেকে কিছু চেয়ে আপনাকে কখনো নিরাশ হতে হবে না।

ড. কুয়ে বলেছেন, 'ইচ্ছা শক্তি **(Will Power)** আর কল্পনার মধ্যে বিরোধ বাধলে কল্পনাই সব সময় জেতে।'

যদি ভাবেন, একটা বদভ্যাস ত্যাগ করতে চান আপনি, সম্ভবত নিজের সাথে প্রতারণা করছেন। সত্যি যদি ওটা ছাড়তে চান, আপনা থেকেই আপনাকে ছেড়ে যাবে ওটা। আপনার আসলে চাওয়া উচিত বদভ্যাসটি ছাড়লে কি লাভ হবে, সেইটা। এই লাভটা যখন পাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠবেন, তখনই ছাড়তে পারবেন ক্ষতিকর অভ্যেস। লাভ পাবার জন্যে অস্থির হওয়া, এটা একটা শেখার বিষয়। লাভ পাবার জন্যে কিভাবে অস্থির হতে শিখতে হয় তা যখন জানা হয়ে যাবে আপনার, অবাঞ্ছিত অভ্যেস ছেড়ে দেয়া তখন আর সমস্যা হবে না।

খারাপ অভ্যেস সম্পর্কে বেশি চিন্তা করা, ছেড়ে দেবো বলে বার বার প্রতিজ্ঞা করা, অনেক সময় এর ফল হয় উল্টো, অভ্যেসটা আরো শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে আপনাকে। ব্যাপারটা অনেকটা ঘুম আনার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠার মতো, যতোই আপনি অস্থির হবেন ততোই আপনি জেগে থাকবেন, ঘুম আসতে চাইবে না।

এখন দেখা যাক এসব ব্যাপার আমরা নিজেদের কাজে কিভাবে ব্যবহার করতে পারি। এখানে আমরা দুটো অভ্যেস নিয়ে আলোচনা করবো। একটা হলো অতিভোজন, অপরটা ধূমপান।

আপনি যদি ওজন কমাতে চান, আপনার প্রথম কাজ হবে সমস্যাটাকে খতিয়ে পরীক্ষা করা। এই কাজ আপনি জেগে থাকা অবস্থায় অর্থাৎ বিটা লেভেলে করবেন।

আগে জানুন, আপনার সমস্যা অতিভোজন, নাকি ব্যায়ামের অভাব, নাকি দুটোই?

এমনও হতে পারে, অতিভোজন নয়, খাচ্ছেন আপনি পরিমাণ মতোই, কিন্তু খাচ্ছেন ভুল খাবার, সেটাই মেদ বাড়িয়ে তুলে সমস্যার সৃষ্টি করছে। সেক্ষেত্রে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে কি কি খাবেন আর কি কি খাবেন না সেটা ঠিক করতে হবে আপনাকে, তাহলেই ওজন কমানো সম্ভব হয়ে উঠবে।

তারপর নিজেকে প্রশ্ন করুন, ওজন কমাতে চাইছেন কেন? আপনি কি এতোই মোটা যে আপনার স্বাস্থ্য বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে? এতোই মোটা যে বেঁচে থাকাটা কষ্টকর হয়ে উঠেছে? নাকি ভাবেন, আরো রোগা হতে পারলে আরো সুন্দর দেখাবে নিজেকে? যেটাই হোক, ওজন কমাবার যুক্তি হিসেবে দুটোই শক্তিশালী।

আগে জানুন, ওজন কমিয়ে তা থেকে কি লাভ পেতে চান আপনি।

এমন হতে পারে, আপনি হয়তো পরিমিত খাওয়াদাওয়া করেন, যতটুকু দরকার ততোটুকু ব্যায়ামও করে চলেছেন নিয়মিত, এবং আপনার ওজনও খুব নয়, সামান্য বেশি। সেক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হবে, ডাক্তার যদি আপত্তি না করেন, সামান্য এই বাড়তি ওজনটুকু নিয়েই আপনি সন্তুষ্ট থাকুন। শরীরের নিজস্ব নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে, সেটা অকারণে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই তো ভালো। তাছাড়া, জীবনে সমস্যা কি আর একটা? এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো, সেগুলো সমাধানের জন্যে ব্যবহার করুন এই বিদ্যা।

তবু যদি মনে করেন আপনার ওজন কমানো দরকার, এবং কারণটাও আপনার জানা থাকে, তাহলে আপনার পরবর্তী কাজ হবে ওজন কমাতে পারলে কি কি লাভ হবে তার একটা তালিকা তৈরি করা। 'দেখতে আমি আরো সুন্দর হবো,' এই ধরনের লাভের কথা বলছি না। নিরেট কি লাভ হবে সেটা বিবেচনা করুন। সম্ভব হলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিন। উদাহরণ থেকে নিয়মটা বুঝে নিন।

দর্শনঃ যখন রোগা ছিলেন তখনকার একটা ফটো বের করুন।

স্পর্শঃ কল্পনা করুন, আবার যখন রোগা হবেন, আপনার হাত, উরু আর তলপেট ছুঁলে কি রকম মসৃণ লাগবে।

স্বাদঃ নতুন যে পথ্য গ্রহণ করতে হবে, সেগুলোর স্বাদ কল্পনা করুন।

ঘ্রাণঃ যে খাবারগুলো খেতে হবে সেগুলোর ঘ্রাণ কল্পনা করুন।

শ্রবণঃ আপনি যাদের মতামতের দাম দেন তারা আপনাকে রোগা হতে দেখে খুশি হয়ে কি বলবে সেটা কল্পনা করুন।

কিন্তু শুধু পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ছবি দেখাও যথেষ্ট নয়। সেই সাথে দরকার ভাবাবেগও।

কল্পনা করুন, মনের মতো রোগা হতে পারলে কি রকম খুশি লাগবে আপনার, আত্মবিশ্বাস কতোখানি বেড়ে যাবে।

এসব প্রয়োজনের কথা মনে রেখে, এবার আপনি নিজের লেভেলে চলে যান। পর্দা

তৈরি করুন, সেই পর্দায় ফুটিয়ে তুলুন আপনার এখনকার চেহারা। ছবিটাকে ডানদিকে সরিয়ে পর্দা থেকে বের করে দিন, তারপর নতুন একটা ছবি আনুন বাঁ দিক থেকে। এই ছবিতে নিজেকে রোগা দেখুন, ঠিক যতোটা রোগা হতে চান। ইচ্ছে করলে পুরনো ফটোটাও দেখতে পারেন। এই ছবিটা দেখার সময় নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেবেন, আপনি কি কি খাবার খেয়ে রোগা হতে চাইছেন।

আপনার নতুন চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকার সময় সমস্ত ছোটোখাটো ব্যাপার খুঁটিয়ে লক্ষ্য করুন। এই রকম রোগা হলে আপনার কেমন লাগবে, এক এক করে কল্পনা করুন। এই রকম রোগা হতে পারলে কি কি সুবিধে হবে, এক এক করে কল্পনা করুন। কল্পনা করুন, জুতোর ফিতে বাঁধার জন্যে ঝুঁকে পড়ার সময় কেমন লাগবে আপনার। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠার সময়? এখন যে পোশাকগুলো ছোটো হয় সেগুলো পরলে?

সময় নিয়ে, তাড়াহুড়ো করবেন না, সুবিধে আর লাভগুলো অনুভব করুন। এক একবার এক একটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিন, ওপরে যে নিয়ম দেয়া হয়েছে।

এবার আপনার পথ্যগুলোকে পর্দায় নিয়ে এসে ভালো করে দেখুন আরেকবার। কি কি খাবেন শুধু তাই নয়, পরিমাণে কতোটা খাবেন তাও দেখুন। তারপর নিজেকে বলুন, এই খাবারগুলো এই পরিমাণেই আপনার শরীরের জন্যে দরকার, অন্য কোনো খাবার বা এর চেয়ে বেশি নয়। বলুন, অন্য কোনো খাবারের জন্যে আপনার লোভ জাগবে না।

ধ্যান করার এখানেই শেষ। দিনে দু'বার চর্চা করলেই হবে।

বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অন্য কোনো খাবারের চিন্তা বা ছবি যেন মনে না আসে, যেগুলো আপনার খাওয়া নিষেধ। এতোদিন ওগুলো যে বেশি খেয়েছেন তার কারণ আপনি ওগুলো পছন্দ করেন। কাজেই ওগুলোর কথা শুধু চিন্তা করলেই আপনার কল্পনা আজেবাজে দিকে ছুটে যেতে চাইতে পারে।

আসল কথা হলো হ্যাঁ–সূচক চিন্তা–ভাবনা। এতে যদি অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন, ওজন কমানো কোনো সমস্যা নয়। কি হারাবেন সেটা না ভেবে ভাবুন কি লাভ করবেন।

আরেকটা কথা। ওজন কমাবার প্রোগ্রাম যখন তৈরি করবেন, পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে আপনার, ঠিক কতোটা ওজন কমাতে যাচ্ছেন আপনি। তা না হলে প্ল্যানটা বিশ্বাস্য বলে নাও মনে হতে পারে। আপনার বাড়তি ওজন যদি পঞ্চাশ পাউণ্ড হয়, তাহলে এক হপ্তার মধ্যে চলতি বছরের বিশ্ব সুন্দরী বা বাস্কেট বল খেলোয়াড় করিম আবদুল জব্বারের মতো হতে চাওয়াটা যুক্তিসঙ্গত হবে না। তা হতে চেয়ে মনের পর্দায় ছবি দেখলেও ফল হবে অশ্ব ডিম্ব।

প্রথম ক'দিন রসগোল্লা বা চর্বিযুক্ত মাংসের কথা বার বার ফিরে আসতে পারে মনে। পুরনো অভ্যেস, আপনি ছাড়তে চাইলেও, ওরা আপনাকে ছাড়তে চাইবে না সহজে। ওগুলোর কথা মনে পড়ে গেলে রসনা যদি লোলুপ হয়ে ওঠে, তখন কি করবেন? তখন হয়তো ধ্যানমগ্ন হওয়ার সুযোগ থাকবে না, কাজেই ওগুলোর প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্যে অন্য উপায় ধরতে হবে আপনাকে।

বুক ভরে শ্বাস নিন। তিনটে আঙুল এক করুন। তারপর নিজেকে আগের কথা-গুলোই বলুন, ধ্যানমগ্ন অবস্থায় যেগুলো বলেছিলেন। পথ্যগুলো কল্পনা করুন, তারপর বলুন, 'শুধু এই খাবারগুলোই আমার শরীরের জন্যে দরকার।' বলুন, 'এগুলো ছাড়া অন্য কোনো খাবারের জন্যে আমার লোভ জাগবে না।' এই সুযোগে আপনার রোগা-পাতলা হ্যাণ্ডসাম ছবিটা একবার যদি দেখে নিতে পারেন, ভালো হয়।

মন-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চর্চা করলে সামগ্রিক ভাবে আপনার মানসিক অবস্থার উন্নতি হবে, তাতে করে বিশেষ কোনো চেষ্টা ছাড়াই নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে আপনাআপনি উপকৃত হবে আপনার শরীর। তার ওপর যদি বিশেষ একটা সমস্যা সমাধানের জন্যে একটু চেষ্টা করেন, অতি চমৎকার সুফল ফলার সম্ভাবনা ষোলো আনা। ওজন কমাবার জন্যে অস্থির হবার দরকার নেই, সহজ সরল ভাবে পদ্ধতি ধরে এগোন, সামগ্রিক মানসিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় আপনার শরীর নিজেই প্রয়োজনীয় ওজন কমাবার কাজে নেমে পড়বে।

ওপরে যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তার নানা দিক আছে, সেগুলোও আপনি ব্যবহার করতে পারেন। এই দিকগুলো আপনি দেখতে পাবেন ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। একজন লোকের কথা বলি। সে শ্রমিক। আলফা লেভেলে পৌঁছে নিজেকে বলতো, 'শুধু আমার শরীরের জন্যে ভালো খাবারগুলো খেতে চাইবো আমি, তাছাড়া আর কিছু খেতে ইচ্ছে করবে না আমার। 'হঠাৎ করেই দেখা গেল মিষ্টি, আলু, মাংস, এরকম অনেক খাবারের প্রতি অরুচি এসে গেছে তার, বদলে ভালো লাগতে শুরু করেছে সবুজ শাকসব্জি। লোকটা চার মাসে চল্লিশ পাউণ্ড ওজন হারায় সামান্যতম অসুস্থ না হয়ে।

আরেক মহিলা, তিনিও এই একই টেকনিক ব্যবহার করেন। একদিন বাজার করতে গিয়ে এক বাক্স মিষ্টি কিনে নিয়ে এলেন। প্রত্যেকের জন্যে হিসেব করে কেনা, মাথা পিছু একটা করে। ছেলেমেয়েদের জন্যে তিনটে, মেহমানদের জন্যে পাঁচটা, স্বামীর জন্যে একটা, বাড়ির ঝি-র জন্যে একটা। তাঁর নিজের ভাষায়, 'নিজের জন্যে কেনার কথা আমার মনেই পড়েনি! বাড়িতে এসে ব্যাপারটা উপলব্ধি করলাম। আনন্দে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করলো।'

একজন কৃষক, একশো পঞ্চাশ ডলার দিয়ে একটা স্যুট তৈরি করালো। মাপের চেয়ে অনেক ছোটো করে তৈরি করালো স্যুটটা। এতো ছোটো যে ট্রাউজারটা কোমর পর্যন্ত তুলতেই পারে না, বোতাম লাগাতে পারে না জ্যাকেটের। 'সেলস্‌ম্যান লোকটা আমাকে পাগল ভেবেছিল। কিন্তু পর্দা টেকনিক ব্যবহার করে চার মাসে পঁয়তাল্লিশ পাউণ্ড হালকা হই আমি। স্যুটটা এখন নিখুঁত ভাবে ফিট করে।'

প্রতি ক্ষেত্রেই ফলাফল এতো সুন্দর হয় না। তা অবশ্য হবার কথাও নয়। ভালো ফল পাবার ব্যাপারটা অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। একটা নিয়মের ভেতর থাকার জন্যে যেসব শর্ত মেনে চলা দরকার সবার পক্ষে সে-সব শর্ত মেনে চলা সম্ভব হয় না। আসল কথা হলো, চাওয়া। এই চাওয়া যদি দুর্বল হয়, ফলাফলও দুর্বল হতে বাধ্য।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে ডেনভারের ক্যারোলিন ডি স্যাণ্ডি আর জিম উইলিয়ামের একটা এক্সপেরিমেন্টের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ক্যারোলিন এক মাসের জন্যে একটা কর্ম-শিবিরের আয়োজন করেন। কথা

ছিলো, পঁচিশ জন নারী–পুরুষ হপ্তায় একবার করে এক জায়গায় জড়ো হবে। এদের মধ্যে পনেরো জন প্রত্যেকটি অধিবেশনে উপস্থিত থাকলো, কিন্তু বাকি দশজন অংশগ্রহণ করলো অনিয়মিত ভাবে। নিয়মিত পনেরো জনের গড় হিসেবে দেখা গেল, সোয়া চার পাউণ্ডের একটু বেশি করে ওজন কমেছে। প্রত্যেকেরই কমেছে ওজন। তবে অনিয়মিতদের কমেছে গড়ে মাত্র এক পাউণ্ড।

এক মাস পর, এদের পনেরোজনের খোঁজখবর নিতে গিয়ে ক্যারোলিন জানতে পারেন, সাতজন এখনো একটু একটু করে ওজন হারাচ্ছে, আটজন স্থির হয়ে আছে আগের জায়গায়। একজনেরও ওজন বাড়েনি। আর অনিয়মিত দশজনের আটজনই ফিরে গেছে আগের ওজনে।

ধূমপান একটা ভয়ঙ্কর বদভ্যাস। আপনি যদি ধূমপায়ী হন, প্রাক্তন–ধূমপায়ী হওয়ার জন্যে ধূমপান ছেড়ে দিতে শুরু করার এখনই সময়। ওজন কমাবার জন্যে আমরা যা করেছি, এক্ষেত্রেও ছোটো ছোটো সহজ নিয়ম ধরে এগোবো, যাতে মন থেকে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের নির্দেশ পেয়ে তা মেনে চলা শিখতে প্রচুর সময় পায় আমাদের শরীর।

কেন ছাড়বেন তাই নিয়ে বিটা লেভেলে যুক্তির অবতারণা করার কোনো দরকার নেই, ছাড়তে চাওয়ার কারণগুলো সবার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। দরকার যেটা, কি কি লাভ হবে তার একটা তালিকা তৈরি করা। পরে এই লাভগুলো এতো পরিষ্কার, উজ্জ্বল ভাবে মনের পর্দায় দেখবেন যে নিজে থেকেই তখন ধূমপান ছাড়তে ইচ্ছে হবে।

নিজের লেভেলে চলে যান। দিনের যে সময়ে প্রথম সিগারেট ধরান সেই সময় এবং পরিবেশটা মনের পর্দায় দেখুন। নিজেকে পরিষ্কার ভাবে দেখতে পেতে হবে, আপনার শরীরের সমস্ত পেশী ঢিল হয়ে আছে, কোনো উত্তেজনায় ভুগছেন না। এই মুহূর্তটি থেকে পরবর্তী একটি ঘন্টা দেখতে হবে নিজেকে আপনার, এই সময় সাধারণত যা যা করে থাকেন আপনি সব করবেন, শুধু সিগারেট খাওয়া ছাড়া। সময়টা যদি সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটা হয়, নিজেকে বলুন, 'এখন থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত আমি একজন প্রাক্তন–ধূমপায়ী হিসেবে থাকবো। প্রাক্তন–ধূমপায়ী হিসেবে এই একটা ঘন্টা উপভোগ করবো আমি। প্রাক্তন–ধূমপায়ী হিসেবে এই সময়টা কাটানো একেবারে সহজ, এতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।'

এই অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে আপনাকে যতোদিন না বিটা লেভেলে ওই সময়টায় ধূমপান না করেও সম্পূর্ণ শান্ত এবং অনুত্তেজিত থাকতে পারেন। এই একই নিয়ম ধরে দ্বিতীয় ঘন্টার জন্যে সাজেশন দেবেন নিজেকে, তারপর তৃতীয় ঘন্টার জন্যে, এভাবে সময় বাড়াবেন। ধীরে–সুস্থে এগোনোই ভালো, তাড়াহুড়ো করলে আপনার শরীরের ওপর অত্যাচার করা হয়ে যাবে, যা তার প্রাপ্য নয়। কারণ, আপনার শরীর নয়, অভ্যেসটা আমদানী করেছিল আপনার মন। তাড়াবার কাজটা তাকেই করতে দিন। কল্পনার সাহায্য নিয়ে আপনার মনই পারবে অভ্যেসটাকে বিদায় করতে।

ধূমপানের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে দু'একটা পরামর্শ।

১। ঘন ঘন ব্র্যাণ্ড বদল করুন।

২। দিনের যে সময়টায় আপনি প্রাক্তন–ধূমপায়ী নন, সিগারেট ধরাতে যাবার

আগে প্রতিবার নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, 'সত্যিই কি এটা এখন আমার দরকার আছে?' বেশিরভাগ সময় উত্তর হবে, না। যতোক্ষণ না সত্যি ওটা দরকার হচ্ছে ততোক্ষণ অপেক্ষা করুন।

৩। অভিশাপ-মুক্ত সময়ে কখনো যদি ধূমপান করার প্রচণ্ড ইচ্ছা জাগে, যদি মনে হয় এখন আপনার সিগারেট খাওয়া দরকার, বুক ভরে বাতাস নিন, তিন আঙুল এক করুন, এবং ধ্যানমগ্ন অবস্থায় যে শব্দ ব্যবহার করেছিলেন সেই একই শব্দ ব্যবহার করে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিন, 'যাই ঘটুক না কেন, এই একঘন্টা আমি অধূমপায়ী থাকতে চাই, থাকতে পারবো।'

ধূমপান নিয়ন্ত্রণ করার আরো টেকনিক আছে, মূল পদ্ধতিটির সাথে সেগুলোও আপনি ব্যবহার করতে পারেন। আট বছর ধরে দিনে দেড় প্যাকেট সিগারেট খেতো এক লোক, আলফা লেভেলে পৌঁছে মনের পর্দায় দেখলো, এতোদিন ধরে যতো সিগারেট খেয়েছে সব এক জায়গায় জড়ো করায় বিরাট এক স্তূপ তৈরি হয়েছে, সেই স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিলো সে।

এরপর সে মনের পর্দায় দেখলো, সিগারেট যদি না ছাড়ে তাহলে ভবিষ্যতে যতো সিগারেট খাবে সেগুলো এক জায়গায় জড়ো করায় আরো একটা বিরাট স্তূপ তৈরি হয়েছে, তাতেও আগুন ধরালো সে। এর আগেও এই লোক বেশ কয়েক বার সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু এবার মাত্র একবার ধ্যানমগ্ন হয়ে সেই যে সিগারেট ছাড়লো, আর ধরেনি। ছেড়ে দেয়ার পর কোনো অসুবিধে হয়নি তার, কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ারও শিকার হয়নি।

নিয়মিত অনুশীলনের জন্যে এখানে কয়েকটা ফর্মূলা দেয়া হলো।

অভ্যাস নিয়ন্ত্রণঃ ভোজন (১)

আপনার বাড়তি ওজনের পরিমাণ যদি খুব বেশি হয়, এবং এই ওজন যদি কমাতে চান, তিন—এক পদ্ধতির সাহায্যে নিজের লেভেলে চলে যান, তারপর আপনার ওজন সমস্যাটা বিশ্লেষণ করুন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় চিন্তা করে বের করুন কোন্ ধরনের খাবার আপনার এই ওজন-সমস্যার জন্যে দায়ী। যে খাবারগুলো দায়ী বলে মনে হবে, প্রত্যেকটিকে মনের পর্দায় দেখুন, এক এক করে প্রত্যেকটির গায়ে বড় লাল অক্ষরে লিখুন—না।

অভ্যাস নিয়ন্ত্রণঃ ভোজন (২)

আপনি যদি ওজন বাড়াতে চান, যে-সব খাবার খেলে ওজন বাড়ে সেগুলো বেশি করে খেতে অভ্যস্ত হোন। খাবারগুলো চিবিয়ে, ধীরে ধীরে খাবেন। যে-সব খাবার সামনে নিয়ে বসবেন সেগুলোর দিকে গভীর মনোযোগ থাকা চাই, যাতে স্বাদ এবং গন্ধ পুরোপুরি উপভোগ করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

অভ্যাস নিয়ন্ত্রণঃ ধূমপান

দিনের প্রথম সিগারেট যখন ধরান তখন সিগারেট না ধরিয়ে ধ্যানমগ্ন হোন, নিজেকে বলুন, প্রথম সিগারেটটা একঘন্টা পর ধরাবো। এইভাবে সময়টা একঘন্টা

একঘন্টা করে বাড়াতে থাকুন, যতোদিন না দিনে মাত্র দু'একটা সিগারেট খাওয়ার সময় পান হাতে। এভাবে যদি কমিয়ে আনতে পারেন, একেবারে ছেড়ে দেয়া তখন আর কোনো সমস্যা হবে না।

আপনি যাদের ভালোবাসেন তাদের মুখ চেয়ে সিগারেট ছেড়ে দেয়া উচিত।

নয়

ডাক্তারি

জ্বী, তাঁর নাম ডা. মন। সবচেয়ে বড় ডিগ্রী নিয়ে আপনার শরীরের ভেতরেই চেম্বার খুলে বসে আছেন। হাউজ-ফিজিশিয়ান বা গৃহচিকিৎসক বলতে যা বোঝায়, উনি ঠিক তাই। বারবার তাঁকে কল দিতে হয় না, উনি নিজে থেকেই নিয়মিত আপনার শরীরের খবরাখবর নেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করে থাকেন। জননী এবং সন্তানের সাথে যে সম্পর্ক, আপনার সাথে ওই ডাক্তার সাহেবেরও অনেকটা সেই রকমই সম্পর্ক। মা যেমন নিজে থেকেই সন্তানের যত্ন-আত্তি করে, কিন্তু সন্তান না চাইলে তাকে দুধ দেয় না, সেই রকম আপনার এই হাউজ-ফিজিশিয়ানও আপনার শরীরের যত্ন আত্তি করেন, কিন্তু আপনি না চাইলে আপনার রোগমুক্তি ত্বরান্বিত করেন না, বা আপনি না চাইলে কিছু কিছু রোগ সারাবার জন্যে তেমন গা করেন না। শুধু প্রাচীন কালে দেখা গেছে তাই নয়, বর্তমান কালেও এমন অনেক সাধক বা ধ্যানী পুরুষ এমনকি সাধারণ সংসারী আছেন যাঁরা অসুখ-বিসুখ করলে ডাক্তারের কাছে দৌড়ান না, নিজেরাই নিজেদের চিকিৎসা করেন, এবং সে চিকিৎসায় কোনো রকম ওষুধের ব্যবহার হয় না। এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে অনেকেই গূঢ় রহস্যময় আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োগ বলে বর্ণনা করেন, এবং ব্যবহার করতে ভয় পান। তাঁরা সম্ভবত ভাবেন, অজানা শক্তিকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে না জানি কি হয়! কিন্তু মনকে আমরা দৈনন্দিন কাজে কম-বেশি ব্যবহার তো করছিই, কই, কি ক্ষতি হচ্ছে আমাদের? অসুখ-বিসুখ সারাবার জন্যে ডাক্তার যে ওষুধ-পত্র দিচ্ছেন সেগুলোর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াই বরং আমাদের শরীরের জন্যে বিপদ ডেকে নিয়ে আসছে।

সাইকিক হীলিং (PSYCHIC HEALING) সম্পর্কে হোসে সিলভার অভিজ্ঞতা ব্যাপক। মনকে ব্যবহার করে নিজেরাই নিজেদেরকে সুস্থ করে তুলেছে এই রকম হাজার হাজার রোগীর সাথে সরাসরি আলাপ করেছেন তিনি, তাদের সুস্থ হয়ে ওঠা সম্পর্কে লিখিত রিপোর্টেও গভীর মনোযোগের সাথে চোখ বুলিয়েছেন। তিনি দৃঢ়তার

সাথে জানিয়েছেন, 'এ–ধরনের অসংখ্য ঘটনার কথা জানা আছে আমার, কিন্তু কোথাও শুনিনি বা দেখিনি যে অমুকে নিজের চিকিৎসা করতে গিয়ে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা অন্য কোনো অসুবিধের মধ্যে পড়েছে।'

চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা থেমে নেই, সে সব গবেষণার ফলাফল থেকে এই ধারণাই ক্রমশ আরো দৃঢ় হচ্ছে যে শরীরের সাথে গভীর একটা সম্পর্ক রয়েছে মনের। শরীরটা আমাদের, মনটাও আমাদের, কাজেই ধরে নেয়া চলে এই দুটোর সমস্ত শক্তি আমাদের কল্যাণেই ব্যবহার হওয়ার কথা ঠিক হয়ে আছে।

জানা কথা, নিজেকে সারিয়ে তোলার ব্যাপারে যতোই আপনি দক্ষতা অর্জন করবেন ততোই আপনার ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে যাবার প্রয়োজন কমে আসবে। তবে, মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখার এই পর্যায়ে যতোটুকু আপনি উন্নতি করবেন বলে ধারণা করা যায়, তাতে ডাক্তার সম্প্রদায়কে এখুনি অবসর গ্রহণ করতে হবে বলে মনে হয় না। আপনি ডাক্তারের কাছে যাবেন বৈকি, এখন যেমন যাচ্ছেন, এবং তাঁর পরামর্শও গ্রহণ করবেন। কিন্তু আপনার তরফে প্রথম করণীয় হবে, আশ্চর্য অল্প সময়ের মধ্যে রোগ থেকে সেরে উঠে ডাক্তারকে তাক লাগিয়ে দেয়া। একদিন হয়ত তিনি ভাববেন, লোকটা গেল কোথায়!

মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছে, এমনি কিছু ছাত্রের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, সংকট মুহূর্তে তারা রক্তপাত এবং ব্যথা কমাতে সফল হয়েছে। এখানে মিসেস ডোনাল্ড উইন্ডোস্কি–র কথা উল্লেখ করা যায়। তখন একটা কনভেনশনে যোগ দেয়ার জন্যে স্বামীর সাথে টেক্সাসে রয়েছেন মহিলা। নরউইচ, কানেকটিকাট বুলেটিন পত্রিকার খবর অনুসারে, একটা সুইমিং পুলে ঝাঁপ দিয়ে তিনি তাঁর একটা কানের পর্দা (এয়ারড্রাম) ফাটিয়ে ফেলেন।

'কাছাকাছি শহরটাও অনেক দূরে ছিলো, তাছাড়া, আমি চাইনি আমার স্বামী কনভেনশনে অনুপস্থিত থাকুক,' পত্রিকার সাংবাদিককে তিনি বলেছেন, 'তাই কারো কোনো সাহায্যের আশা না করে আমি নিজেই নিজেকে সাহায্য করার চেষ্টা করি। আলফা লেভেলে চলে যাই আমি, একটা হাত রাখি কানের ওপর, ব্যথার ওপর একাগ্র মনোযোগ রেখে বার বার বলতে থাকি, 'চলে যাও, চলে যাও, চলে যাও!'

ফলাফল?

'প্রায় সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল রক্তপাত, ব্যথাটা কমতে কমতে একেবারে চলে গেল। তারপর যখন ডাক্তারের কাছে গেলাম, বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন তিনি।'

নিজেই নিজের চিকিৎসা করার সহজ সরল ছ'টা নিয়ম আছে, এখানে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করছি।

প্রথম কাজ, বিটা লেভেলে, নিজেকে একজন ভালোবাসার পাত্র হিসেবে অনুভব করা। নিজেকে আপনি বিশ্বাস করানঃ মানুষকে আপনি নিঃশর্তভাবে ভালোবাসেন, আপনাকেও সবাই পছন্দ করে এবং ভালোবাসে। মনে মনে নিজেকে জানান, আপনি ক্ষমাশীল। তারপর ক্ষমাশীল হিসেবে অনুভব করুন নিজেকে। এসব করতে হলে সম্ভবত আপনার মনের ঘর–দুয়ার পরিষ্কার করার দরকার হবে (ছয় নম্বর পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় কাজ, নিজের লেভেলে চলে যান। শুধু ধ্যানমগ্ন হওয়াটাই রোগ সারানোর দিকে বিরাট একটা পদক্ষেপ, একথা আগেই আমরা বলেছি। এই লেভেলে মনের নেতিবাচক বা না–সূচক তৎপরতা থাকে না, থাকে না কোনো রাগ বা অপরাধ বোধ, তাই প্রকৃতি শরীরকে যা করার দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে সেটা নির্বিঘ্নে করতে পারে সে। আপনার মনে রাগ, ঘৃণা, অপরাধ–বোধ ইত্যাদি সত্যি সত্যি থাকতে পারে, কিন্তু সেটা শুধু বিটা লেভেলে। মন–নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চর্চা করতে থাকলে ধীরে ধীরে এই লেভেল থেকেও ওগুলো বিদায় নেবে।

তৃতীয় কাজ, মনে মনে প্রথম কাজগুলো সম্পর্কে নিজের সাথে কথা বলুন। মনের ঘর–দুয়ার পরিষ্কার করার জন্যে আপনার যে বাসনা আছে, সেটা আন্তরিকতার সাথে প্রকাশ করুন। নিজেকে বলুন, আপনি হ্যাঁ–সূচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে চান। বলুন, আপনি আপনার চিন্তা–ভাবনা হ্যাঁ–সূচক করতে চান। বলুন, আপনি সবার ভালো–বাসার পাত্র হতে চান। বলুন, আপনি ক্ষমাশীল হতে চান।

চতুর্থ কাজ, যে অসুস্থতা আপনাকে ভোগাচ্ছে মনে মনে সেটা অনুভব করুন। এখানে আপনি পর্দা পদ্ধতি কাজে লাগাবেন। পর্দায় নিজের অসুস্থতা ফুটিয়ে তুলে সেটা চাক্ষুষ করুন এবং অনুভব করুন। এটা অল্প সময়ের মধ্যে সারবেন।

পঞ্চম কাজ, আপনার অসুস্থতার ছবি পর্দা থেকে সরিয়ে দিয়ে এরপর আনুন আপনার রোগ–মুক্ত সুস্থতার ছবি। সুস্থ থাকার যে আনন্দ আর স্ফূর্তি, সেটা অনুভব করুন। উপভোগ করুন মুহূর্তগুলো, যতোক্ষণ খুশি। মনে মনে জানুন, এই সুস্থতা আপনার প্রাপ্য।

ষষ্ঠ কাজ, আরেকবার মনের ঘর–দুয়ার পরিষ্কার অর্থাৎ শুদ্ধি অভিযান চালান। সবশেষে নিজেকে বলুন, 'প্রতিদিন সবদিক থেকে উন্নতি করছি।'

কতোক্ষণ সময় লাগবে এতে, সারা দিনে ক'বার করতে হবে?

পনেরো মিনিট ধরে করা সবচেয়ে ভালো। যতো বার করবেন ততোই তাড়াতাড়ি উপকার পাবেন, তবে দিনে একবারের চেয়ে কম যেন না হয়। যতোবারই করুন, সেটা বেশি হয়ে যাবার কোনো ভয় নেই।

নিজের চিকিৎসা করার প্রথম পদক্ষেপ, এর কোনো শেষ নেই। এটা বিটা, আলফা এবং থিটায় চর্চা করুন। ভালোবাসার পাত্র হতে বলা হয়েছে আপনাকে, বলা হয়েছে ক্ষমাশীল হতে—দৈনন্দিন জীবনে তাই হোন। ওই ভাবে বাঁচুন। ভালোবাসার পাত্র এবং ক্ষমাশীল হওয়ার পথে দিনের বেলা যদি কোনো বাধা আসে, যদি মনোযোগ ছুটে যেতে চায়, শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে তিন আঙুল এক করুন।

হোসে সিলভার অনেক ট্রেনিং স্কুল থেকে ছাত্রদের জন্যে রিপোর্ট ছাপা হয়। চিঠির আকারে এই রিপোর্টগুলো অন্যান্য শাখা স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের কাছ থেকেই আসে। সব চিঠিরই বিষয়বস্তু এক, মনকে নিয়ন্ত্রণ করা শিখে তারা কি ধরনের উপকার পাচ্ছে। মাথাব্যথা, হাঁপানি, তোতলামি, শারীরিক দুর্বলতা, আলস্য, হাই ব্লাড–প্রেশার, নার্ভাসনেস, আতঙ্ক, মৃত্যু ভয়, অতিভোজন, ধূমপানে আসক্তি, অনিদ্রা, এমন কোনো সমস্যা নেই যা সাফল্যের সাথে সমাধান করা না গেছে।

এখানে একটা রিপোর্টের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করছি। এটি নির্বাচন করার

কারণ, রিপোর্টটা লিখেছেন একজন ডাক্তার।

'এগারো বছর বয়স থেকে মাইগ্রেন মাথাব্যথায় ভুগছি আমি। প্রথম দিকে মাঝে মধ্যে আক্রমণ হতো, তখন সেটা কমানোও যেতো। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে ব্যথাটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে লাগলো, এবং শেষ পর্যন্ত শিকার হয়ে পড়লাম ক্লাস্টার হেডেক-এর। তিন থেকে চার দিন থাকতো এই ব্যথা, প্রতিটি আক্রমণের মাঝখানে বিরতি থাকতো মাত্র দু'দিন। ভয়ঙ্কর মাইগ্রেন হেডেক আসন গেড়ে বসছিল··· সাধারণত আক্রমণটা হতো মুখ আর মাথার একটা পাশে। চোখ দুটো মনে হতো কেউ যেন ভেতর থেকে ঠেলে কোটরের বাইরে বের করে দিয়েছে। খোঁচানো ধরনের তীব্র ব্যথা, পেটের নাড়িভুঁড়ি সব ওলট-পালট হয়ে যেতে চাইতো। বিশেষ ভাবে তৈরি এক ধরনের ভ্যাসোকনস্ট্রিকটিং ড্রাগ দিয়ে মাঝে মধ্যে রেহাই পাওয়া যেতো, ব্যথা শুরু হওয়ার প্রথম দিকে যখন সেটা সহনীয় থাকতো তখন নিতে হতো ওই ওষুধ। শুরু হবার পর খানিকটা সময় পেরিয়ে গেলে কোনো কিছুতেই আর কমাবার উপায় ছিলো না, একমাত্র সময় পূরণ হলে নিজে থেকেই থেমে যেতো। এমন একটা পর্যায়ের দিকে এগোচ্ছিলো ব্যথাটা, ওই বিশেষ ভাবে তৈরি করা ওষুধ প্রতি চার ঘন্টা পর পর নিলেও সেটাকে পুরোপুরি দমন করা সম্ভব হতো না।

'খুব নামকরা একজন মাথাব্যথা বিশেষজ্ঞের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে সবদিক থেকে পরীক্ষা করে রায় দিলেন, ফিজিক্যাল বা নিউরোলজিক্যাল কোনো অস্বাভাবিকত্ব আমার মধ্যে নেই। তিনি আমাকে কিছু উপদেশ আর চিকিৎসা পদ্ধতি দিলেন। ওগুলো যে আমি অনেক আগে থেকেই মেনে চলছি আর ব্যবহার করছি তা আর তাঁকে বললাম না। ব্যথার আক্রমণ চলতে থাকলো।

'আমার এক রোগী সিলভা ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রী ছিলো, কোর্স শেষ করে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। প্রায় বছর খানেক থেকে আমাকে ওই ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি করাবার চেষ্টা করছিল সে। প্রসঙ্গটা উঠলেই আমি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে তাকে বলতাম, রাখো তোমার মন-নিয়ন্ত্রণ, ওসব ভাঁওতাবাজি আমি বিশ্বাস করি না! সব ভুয়া! কিন্তু তারপর একদিন, সেদিন আমার এক দফা মাথাব্যথার চতুর্থ দিন, দেখা করার জন্যে আমার কাছে এলো সে। আমার চেহারা দেখেই যা বোঝার বুঝে নিলো, মুখ ফুটে কিছু বলতে হলো না। আমাকে বললো সে, "এখনো আপনি জেদ ধরে থাকবেন? একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? উপকার না পেলে কোর্স কমপ্লিট করবেন না। নতুন একটা কোর্স শুরু হতে যাচ্ছে···যাবেন আমার সাথে?"

'গেলাম। দস্তখত করে ভর্তি হলাম কোর্সে। প্রথম হপ্তায় প্রতিটি ক্লাস করলাম, যা যা শেখানো হলো সব অন্তর দিয়ে শেখার চেষ্টা করলাম, কেন জানি না, ওই হপ্তায় মাথায় কোনো ব্যথা হলো না। কিন্তু কোর্সটা শেষ করার এক হপ্তা পর প্রচণ্ড একটা মাথাব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙলো আমার। ভাবলাম, পদ্ধতিটা সত্যি কাজ করে কিনা পরীক্ষা করে দেখার এই একটা সুযোগ। এক শো থেকে এক পর্যন্ত গুণে ধ্যানমগ্ন হলাম, তারপর আগে থেকে তৈরি করে রাখা সাজেশন দিলাম নিজেকে। সাজেশন দেয়া শেষ হয়েছে, বিটায় ফিরে এসেছি, একটু পরেই ব্যথাটা সেরে গেল। বিস্ময়ে, আনন্দে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কিন্তু আবার মুষড়ে পড়তে বেশি সময় লাগলো না, কারণ কয়েক সেকেণ্ড

পরই ফিরে এলো ব্যথাটা—এবার আরো জোরেশোরে। কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না, আরেকবার ধ্যানমগ্ন হয়ে সাজেশন দিলাম নিজেকে। এবারও দূর হলো ব্যথা, কিন্তু অল্প সময়ের জন্যে। যতোবার ব্যথা ফিরে আসে, আমিও নাছোড়বান্দার মতো ততোবার ধ্যানমগ্ন হয়ে নিজেকে মাথাব্যথার বিরুদ্ধে সাজেশন দিই। এই সময় একবারও আমি ওষুধ নিইনি। এভাবে এক এক করে দশবার ধ্যানমগ্ন হওয়ার পর ব্যথাটা সত্যি সত্যি হার মানলো, সেদিন আর মাথাচাড়া দিলো না।

'পরদিন বা তার পরদিনও ব্যথাটা ফিরে এলো না। যেদিন এলো, মাত্র দু'বার ধ্যানমগ্ন হয়ে সাজেশন দিতেই পালিয়ে গেল সেটা। এরপর যদিও আরো তিন মাস মাথাব্যথায় ভুগতে হয়েছে আমাকে, কিন্তু প্রতিবার আক্রান্ত হতাম অল্প সময়ের জন্যে, পেইনকিলার ট্যাবলেট খাওয়ার প্রয়োজন বোধ করতাম না। মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখার পর থেকে অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ একবারও খাইনি আমি। শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস এলোঃ পদ্ধতিটি সত্যি কাজ করে!'

এখানে আরো একজনের কাহিনী না বললেই নয়। ডেট্রয়ট, মিশিগানের একজন নান, সিসটার বারবারা। সিসটার বারবারার কাহিনী বেছে নেয়ার কারণ, ধ্যানমগ্ন অবস্থাটাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করে মনের কাছ থেকে দুর্লভ একটা চিকিৎসা আদায় করে নিতে পেরেছেন তিনি।

কাছের জিনিস দেখতে পান না বলে সাতাশ বছর ধরে চশমা পরেন সিসটার বারবারা। যতোই কম দেখতে পেতেন, তাঁর চশমার লেন্স ততোই বাড়াতে হতো, এবং এক সময় বোঝা গেল তিনি দূরের জিনিসও আগের মতো ভালো দেখতে পাচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাইফোকাল নিতে হলো। তারপর উনিশ শো চুয়াত্তর সালে, তিনি ঠিক করলেন মন-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাহায্য নেবেন। গভীর ধ্যান করে নিজেকে তিনি বললেন, 'যতো বার আমি চোখের পাতা ফেলবো, সবকিছু নিখুঁতভাবে পরিষ্কার দেখতে পাবো, ঠিক ক্যামেরার মতো।' ধ্যানমগ্ন হলে প্রতিবার এই কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করতেন তিনি। দু'হপ্তা পর দেখা গেল, তিনি চশমা ব্যবহার করছেন না, তবে পড়াশোনার সময় ওটা লাগে। তিনি ডাক্তার রিচার্ডের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলেন। পরীক্ষা করে দেখে ডাক্তার রিচার্ড তাঁকে জানালেন, আপনার কর্ণিয়ার আকৃতিতে সামান্য একটু গোলমাল আছে। ডাক্তারের কাছ থেকে ত্রুটিটা কি জানার পর সিসটার বারবারা তাঁর ধ্যানের মধ্যে একটা নতুন সাজেশন জুড়ে দিলেন, 'আমার কর্ণিয়াতে যে গোলমাল আছে তা যেন সেরে যায়।' এভাবে কয়েক হপ্তা কেটে যাবার পর আবার তিনি ডাক্তারের কাছে গেলেন।

ড. রিচার্ড অনেক পরে তাঁর এক রিপোর্টে কি লিখেছেন, দেখুন।

"বিশে আগস্ট, উনিশ শো চুয়াত্তর, সিসটার বারবারাকে প্রথম আমি পরীক্ষা করি...

"পরে আবার তাঁকে আমি পরীক্ষা করি ছাব্বিশে আগস্ট, উনিশ শো পঁচাত্তরে। গত এক বছর ধরে তিনি চশমা ব্যবহার করছিলেন না...

"আমার রোগিনীর মাইওপিয়া সুস্পষ্টভাবে এমন এক পর্যায়ে নেমে এসেছে যেখানে চশমা ব্যবহার করার কোনো দরকার করে না।"

ডাক্তার সাহেবের মাইগ্রেন মাথাব্যথা বা সিসটারের দৃষ্টি ক্ষীণতা, দুটোর একটাও তেমন ভয়ঙ্কর কোনো রোগ নয়। কিন্তু ভয়ঙ্কর কোনো রোগ যদি আক্রমণ করে, তখনো কি আমরা এই পদ্ধতির সাহায্য পাবো? নাকি শুধু ওষুধ খাবো আর নিজেকে ছেড়ে দেবো ভাগ্যের ওপর? আসুন, সবচেয়ে ভীতিকার রোগ, ক্যানসারের দিকে একটু তাকানো যাক।

ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ড. ও কার্ল সিমনটন-এর নাম এবং তাঁর গবেষণা সম্পর্কে অনেকেই শুনেছেন। তাঁর এই গবেষণার কিছুটা বর্ণনা পাওয়া যায় মেরিলিন ফার্গুসনের লেখা জনপ্রিয় বই 'দি ব্রেন রেভোলিউশন'-এ। উনিশ শো ছিয়াত্তর সালে প্রিভেনশন ম্যাগাজিন তাঁর সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ ছাপে, প্রবন্ধটার নাম দেয়া হয়, মাইণ্ড ওভার ক্যানসার, লেখক ছিলেন গ্রেস হলসেল। ড. সিমনটন মনকে নিয়ন্ত্রণ করার টেকনিক শিখেছিলেন, তাঁর রোগীদের চিকিৎসা করার জন্যে এই সব টেকনিক সাফল্যের সাথে ব্যবহার করেন।

সানফ্রান্সিসকোর কাছে ট্রাভিজ এয়ারফোর্স বেসে রেডিয়েশন থেরাপির চার্জে থাকার সময় একটা দুর্লভ কিন্তু অতি পরিচিত রহস্যের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাঁর। —কেউ কেউ ক্যানসার থেকে সেরে ওঠে, অথচ চিকিৎসা বিজ্ঞান এর কোনো কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে না। এই ধরনের রোগমুক্তিকে স্পনটেনিয়াস রেমিশন বলে। কিন্তু হাজারে বা লাখে মাত্র দু'একজন রোগী এই নিষ্কৃতি পেয়ে থাকে। তিনি যুক্তিশক্তি দিয়ে উপলব্ধি করলেন, কেন এরা ভালো হয়েছে তা যদি জানা যায় তাহলে হয়তো আরো রোগীর ভালো হবার কারণ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

গবেষণা করতে গিয়ে ড. সিমনটন দেখলেন, যারা ভালো হয়েছে তাদের সবার মধ্যে অদ্ভুত একটা মিল রয়েছে। এরা সবাই যার যার জীবনে সন্তুষ্ট, আশাবাদী, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, আত্মবিশ্বাসী এবং দৃঢ়চেতা। একটা কনভেনশনে বক্তৃতা দেয়ার সময় তিনি যা বলেছিলেন এখানে তার অংশবিশেষের সার উল্লেখ করা হলো।

সাধারণভাবে ক্যানসারের বেড়ে ওঠা সম্পর্কে তদন্ত চালাতে গিয়ে, রোগটা ধরা পড়ার ছয় থেকে আঠারো মাস আগে, তাৎপর্যপূর্ণ একটা মানসিক বিপর্যয় চিহ্নিত করতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।

স্বাধীন অনুসন্ধানকারীদের বিভিন্ন জোট দীর্ঘ মেয়াদী পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এই ব্যাপারটা সনাক্ত করেন।...আমরা দেখি, শুধু ওই বিপর্যয়টাই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার নয়, আসলে ব্যক্তিটি ওই বিপর্যয়টাকে যেভাবে গ্রহণ করছেন সেটাই তাৎপর্যপূর্ণ।

ওই বিপর্যয় বা ক্ষতি পরিমাণে এতো বেশি যে একটা অসহায় বোধ, একটা নৈরাশ্য বোধ রোগীকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলে। এতে করে তার মূল প্রতিরোধক শক্তিটি ধ্বংস হয়ে যায়, এবং এই সুযোগে ভয়ঙ্কর রোগটি বেড়ে উঠে রোগীকে শয্যাশায়ী করে ফেলে।

ট্রাভিজ এয়াফোর্স বেসে আরেকটা পরীক্ষা চালানো হয়। জার্নাল অব ট্র্যান্স পারসোনাল সাইকোলজি-তে এই পরীক্ষা সম্পর্কে লেখা হয়েছিল। একশো বাহান্ন জন ক্যানসার রোগীকে নিয়ে পরীক্ষাটা ড. সিমনটন চালান। এদের মধ্যে প্রচণ্ড আশাবাদী

অর্থাৎ হ্যাঁ–সূচক চিন্তা–ভাবনার অধিকারী লোকও যেমন ছিলো, তেমনি প্রচণ্ড হতাশাগ্রস্ত, না–সূচক চিন্তা–ভাবনায় মুষড়ে পড়া লোকজনও ছিলো। থেরাপি চিকিৎসা কার কতোটা ভালো করে, পরীক্ষা করতে গিয়ে ড. সিমনটন দেখেন, বিশজনের বেলায় চিকিৎসার ফল অত্যন্ত ভালো পাওয়া গেল। যদিও এদের মধ্যে চোদ্দ জনেরই অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর ছিলো, শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও কম সম্ভাবনা পাঁচ বছর বাঁচবে কিনা। তবু চিকিৎসায় কাজ হওয়ার কারণ হলো, এরা কেউ ভেঙে পড়েনি, প্রবণতার দিক থেকে সবাই ছিলো আশাবাদী। অপরদিকে, বাইশ জনের বেলায় চিকিৎসার ফল ভালো হলো না। এরা সবাই হতাশায় মুষড়ে পড়া মানুষ।

আরেকটা কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়। আশাবাদী এবং হ্যাঁ–সূচক দৃষ্টিভঙ্গির কিছু লোক বাড়িতে ফেরার পর তাদের চিন্তা–ভাবনা এবং প্রবণতা সম্পূর্ণ উল্টো খাতে বইতে শুরু করায় তাদের অবস্থারও দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করে। এ থেকে বোঝা যায়, রোগের ভয়াবহতার চেয়ে রোগীর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে থাকে।

ড. সিমনটন এবং তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে মেনিনজার ফাউণ্ডেশনের ড. এলমার গ্রীন বলেছেন, 'ফিজিওলজিকাল সেলফ–রেগুলেশনের জন্যে মনের পর্দায় ছবি দেখার পদ্ধতির সাথে ট্র্যাডিশনাল রেডিওলজি এক করে চিকিৎসা করায় ক্যানসার নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ফল পাচ্ছেন ড. সিমনটন এবং তাঁর স্ত্রী।'

আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ইউজিন পেনডারগ্রাস উনিশ শো ঊনষাট সালে বলেছিলেন, 'মানসিক বিপর্যয় যে এই রোগের গতিবিধি প্রভাবিত করে তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। গবেষণার ক্ষেত্র আরো বাড়িয়ে আমাদের দেখতে হবে, মানুষের মনে এমন একটা শক্তি আছে কিনা যার সাহায্যে এই রোগ বাড়তে বা বাধা পেতে পারে।'

ফোর্ট ওর্থ–এর ক্যানসার কাউন্সেলিং অ্যাণ্ড রিসার্চ সেন্টারের মেডিকেল ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করছেন ড. সিমনটন। কোথেরাপিস্ট হিসেবে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী। রোগ সারাবার জন্যে মনের সাহায্য কিভাবে নেয়া যেতে পারে সে–বিষয়ে রোগীদের ট্রেনিং দেন তাঁরা।

যে–কোনো ধারার চিকিৎসায় ফল পাবার ব্যাপারে রোগীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রবণতা একটা ভূমিকা পালন করে, এই দৃষ্টিভঙ্গি আর প্রবণতা রোগের গতিবিধি বা মতিগতি নিয়ন্ত্রণেও প্রভাব রাখে—ট্রেনিং দেয়ার শুরুতেই এই কথাটা ভালো করে রোগীদের বুঝিয়ে দেন ড. সিমনটন। রোগীরা কিভাবে নিজেরাই নিজেদের চিকিৎসা করবে তা শেখাবার জন্যে মন–নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাহায্য নেন তিনি। তাঁর প্রথম কাজ হয় তাদের মন থেকে ভয় তাড়ানো। তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেন, আমাদের প্রত্যেকের শরীরেরই ক্যানসারাস সেল রয়েছে। শরীর যেমন ফরেন প্রোটিন ধ্বংস করে, তেমনি ক্যান–সারাস সেলগুলোকেও ধ্বংস করে।...সবগুলো ক্যানসার সেলকে শরীর থেকে বের করে দেয়া সম্ভব নয়, কারণ শরীরের ভেতর আমরা সারাক্ষণ ওই সেল তৈরি করে চলেছি। সেলগুলোর সাথে যুদ্ধে শরীরকে জিততে সাহায্য করাই একমাত্র কাজ হতে পারে আমাদের।

আর তাঁর স্ত্রী রোগীদের বলেন, বেশিরভাগ লোকের ধারণা ক্যানসার সেল দেখতে খুবই কুৎসিত, নীচ, চোরাপথে চলাফেরা করে, এবং অত্যন্ত শক্তিশালী—একবার বাড়তে শুরু করলে শরীরের আর কিছু করার থাকে না। ব্যাপারটা ঠিক এরকম না। আর সব সেলের মতোই ক্যানসার সেলও সাধারণ একটা সেল, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে এই হারামজাদার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সত্যি কথা হলো, এটা একটা খুব বোকা সেল, সংখ্যায় এতো দ্রুত বেড়ে ওঠে যে প্রায় সময়েই নিজের রক্ত সরবরাহ সিস্টেমকে ঘেরাও করে অচল করে দেয়, ফলে অভুক্ত অবস্থায় নিজেই মারা পড়ে। ওটাকে কাটুন, বিকিরণের মধ্যে ফেলুন, কিংবা কেমোথেরাপি দিন। একবার যদি ওটা অসুস্থ হয়ে পড়ে, নিজের স্বাস্থ্য আর কখনো ফিরে পায় না। মারা যায়।

এবার স্বাভাবিক, স্বাস্থ্যবান একটা সেলের কথা ধরুন। আপনার হাত কেটে গেল, ব্যাণ্ডেজ ছাড়া আর কিছু ব্যবহার করলেন না, তবু ক্ষতটা আপনা থেকেই সেরে যাবে। আমরা জানি, স্বাভাবিক টিস্যু নিজেই নিজেকে মেরামত করতে পারে—তারা তাদের রক্ত সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় না।

ড. সিমনটন আর তাঁর স্ত্রী রোগীদেরকে তিনটে কাজ দেন। এক, মনের পর্দায় রোগ চাক্ষুষ করা। দুই, মনের পর্দায় চিকিৎসা চাক্ষুষ করা। তিন, শরীরের নিজেকে সারিয়ে তোলার যে ক্ষমতা, সেটা কল্পনা এবং অনুভব করা। সেই সাথে নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ, নিরোগ অবস্থায় চাক্ষুষ করা।

ধ্যান করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন তাঁরা। রোগীদের জিজ্ঞেস করেন, দিনে কতোবার ধ্যান করছেন? ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ঠিক মতো সবগুলো ছবি দেখছেন কিনা?

চর্চা করার জন্যে একটা অনুশীলন দিয়ে এই পরিচ্ছেদ শেষ করবো। এই অনুশীলনটা মাথাব্যথা সারাবার জন্যে। তবে সাজেশনের শব্দ বদলে অন্য কোনো ব্যথা সারাবার কাজেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ফল পাবেন। উদ্বেগ, উত্তেজনা বা দুশ্চিন্তার কারণে যে মাথাব্যথা, সেটা সারাবার জন্যে এই পদ্ধতি একবার ব্যবহার করাই যথেষ্ট। মাইগ্রেন ধরনের মাথাব্যথার জন্যে এই একই পদ্ধতি তিনবার ব্যবহার করবেন, পাঁচ মিনিট পর পর।

মাথাব্যথা দূর করার পদ্ধতিঃ

আপনার যদি মাথা ধরে, তিন—এক পদ্ধতির সাহায্যে নিজের লেভেলে পৌঁছান। তারপর নিজেকে বলুন, 'আমার মাথা ধরেছে; মাথায় আমি ব্যথা অনুভব করছি, আমি এই মাথাব্যথা চাই না; আমি মাথায় ব্যথা অনুভব করতে চাই না।'

তারপর নিজেকে বলুন, 'এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুণতে যাচ্ছি আমি, পাঁচ পর্যন্ত গুণে চোখ খুলবো, চোখ খোলার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় জেগে উঠবো, পুরোপুরি সুস্থ আর ঝরঝরে তাজা থাকবো; তখন আমার মাথায় কোনো ব্যথা থাকবে না; তখন আমার মাথায় আমি কোনো ব্যথা অনুভব করবো না।'

এরপর আপনি ধীরে ধীরে গুণতে শুরু করবেন, এক—দুই—তিন। তিন পর্যন্ত গুণে মনে মনে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেবেন, 'পাঁচ পর্যন্ত গুণে চোখ খুলবো আমি, সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় জেগে উঠবো, পুরোপুরি সুস্থ আর ঝরঝরে তাজা থাকবো। তখন

আমার মাথায় কোনো কষ্ট থাকবে না, তখন আমার মাথায় আমি কোনো ব্যথা অনুভব করবো না।'

এরপর আপনি গুণবেন, চার—পাঁচ। এবং পাঁচ পর্যন্ত গুণে চোখ খুলবেন, মনে মনে নিজেকে বলবেন, 'আমি সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় জেগে উঠেছি, পুরোপুরি সুস্থ আর ঝরঝরে তাজা বোধ করছি। আমার মাথায় কোনো ব্যথা বা কষ্ট নেই। আমি আমার মাথায় কোনো ব্যথা বা কষ্ট অনুভব করছি না।'

দশ

প্রণয় মধুর হোক

স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে। ব্যাপারটা সূক্ষ্ম, কিন্তু তারা সবাই গভীর ভাবেই সেটা অনুভব করে। ছাত্র-ছাত্রীরা আর মাত্র দিন কয়েক পরই ডিগ্রী পাবে, পরস্পরের সাথে আশ্চর্য একটা ঘনিষ্ঠতা, প্রায় স্পর্শযোগ্য ভালোবাসা অনুভব করে। তারা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছিল, কেউ কাউকে চিনতো না, এখানে না এলে জীবনে হয়ত কারো সাথে কারো দেখাও হতো না কোনোদিন। এই ক'বছর এক সাথে লেখাপড়া করার পর আবার তারা কে কোথায় চলে যাবে, আর হয়ত কারো সাথে কারো দেখাই হবে না। অথচ এই ঘনিষ্ঠতা আর ভালোবাসার অনুভূতি সহজেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে পরে যদি আবার কখনো কারো সাথে কারো দেখা হয়।

যুদ্ধের নিবিড় অভিজ্ঞতা অর্জনের পর সৈনিকরাও পরস্পরের সাথে এরকম আশ্চর্য ঘনিষ্ঠতা আর একাত্মতা বোধ করে থাকে। একই অভিজ্ঞতা হয় দুর্ঘটনাবশত কোনো ঘরে বা এলিভেটরে আটকা পড়া একদল লোকের।

মেডিটেশন বা ধ্যানের জগতে আরো একটা ব্যাপার ঘটে। গভীর এবং দীর্ঘ মেয়াদী ধ্যানমগ্ন অবস্থায় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় মনের সাথে মনের। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আমাদের মন অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে ওঠে, তার গ্রহণ ক্ষমতা অস্বাভাবিক বেড়ে যায়, এই সুযোগে আরেকটা মন এসে ছুঁয়ে যায় তাকে আলতোভাবে। আপনার মনের সাথে কার মনের যোগাযোগ হয়? যাকে আপনি ভালোবাসেন, যার সাথে আপনার সারা জীবনের বন্ধন রয়েছে, এ তার মন।

দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে শক্ত ভিত ঘনিষ্ঠতা। ঘনিষ্ঠতা মানে পরস্পরের একান্ত ব্যক্তিগত, স্পর্শকাতর ব্যাপারে নাক গলানো নয়। গভীর সমঝোতা-বোধ আর অন্তরের অন্তস্তল থেকে উঠে আসা দরদ এবং মেনে নেয়া-র আগ্রহ থেকেই ঘনিষ্ঠতার জন্ম।

এই ঘনিষ্ঠতাকে আরো নিবিড় এবং মধুর করার জন্যে আপনি ধ্যান পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারেন। মনের গভীর স্তরে দুই মনকে এক করা সম্ভব। সুখী হওয়ার জন্যে দম্পতিদের সেই পরামর্শ দেবো—শুধু বিটা লেভেলে নয়, আলফা লেভেলেও আপনারা দু'জন মিল ঘটান মনের।

পদ্ধতিটা সহজ, অনুশীলন করা কোনো সমস্যা নয়।

পরস্পরের সম্মতি আছে এমন একটা জায়গা বেছে নিন, যেখানে থাকলে আপনারা দু'জনেই খুশি হন, স্বস্তি বোধ করেন এবং শান্তি পান। মাঝে মধ্যে আপনারা যেখানে ছুটিতে বেড়াতে যান, এই রকম একটা জায়গা হতে পারে। কিংবা যেখানে গেলে মধুর অনেক স্মৃতির কথা মনে পড়ে যায়, সেই জায়গাটা বেছে নিন। দু'জনেরই অচেনা একটা জায়গা হলেও চলবে। কিন্তু এমন একটা জায়গা বেছে নেবেন না যেখানে আপনাদের মাত্র একজন গেছেন বা একজন চেনেন। এ-ধরনের জায়গায় দু'জনের অভিজ্ঞতা দু'রকম হবার ভয় আছে, সমান হারে অংশ গ্রহণের পথে একটা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে ব্যাপারটা।

আরাম করে কাছাকাছি বসুন, চোখ বুজে শরীর ঢিল করে দিন। তারপর যে-যার লেভেলে চলে যান। একজন অপরজনকে সাহায্য করতে পারেন আরও গভীর স্তরে পৌছতে। বলুন ঃ 'আমি দশ থেকে এক পর্যন্ত গুণবো এখন। আমি প্রতিটি সংখ্যা উচ্চারণ করার সাথে সাথে তুমি অনুভব করবে, মনের গভীর স্তরে চলে যাচ্ছো, পৌছে যাচ্ছো ধ্যানমগ্নতার গভীরে। দশ-নয়—অনুভব করো গভীরে নেমে যাচ্ছো—আট-সাত—ছয়-গভীর থেকে গভীরে, আরো গভীরে—পাঁচ—চার—আরো, আরো গভীরে-তিন—দুই—এক। তুমি এখন শান্ত এবং শিথিল, পৌছে গেছো মনের গভীর স্তরে। এবার তুমি আমাকে সাহায্য করবে, ওখানে পৌছে তোমার সাথে মিলিত হবো আমি।'

অপরজন বলবে, 'আমি ধীরে ধীরে দশ থেকে এক পর্যন্ত গুণতে যাচ্ছি, আমি প্রতিটি সংখ্যা উচ্চারণ করার সাথে সাথে তুমি অনুভব করবে মনের গভীর স্তরে চলে যাচ্ছো, পৌছে যাচ্ছো ধ্যানমগ্নতার গভীরে। দশ—নয়—অনুভব করো আমার সাথে গভীরে নেমে যাচ্ছো—আট—সাত—ছয়—আরো, আরো গভীরে, দু'জন একসাথে—পাঁচ—চার—আরো গভীরে, আরো কাছে—তিন—দুই—এক। আমরা দু'জনেই এখন আনন্দময় বিশ্রামের মধ্যে রয়েছি, নেমে এসেছি মনের গভীর স্তরে।'

ইচ্ছে করলে এই অবস্থায় চোখ খুলেও রাখতে পারেন। চোখ বন্ধ থাকলেও ক্ষতি নেই। দুজনেই মনে মনে বলুনঃ 'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় চাওয়া, তোমাকে সুখী করা; এবং শুধু তারপরই নিজেকে আমি সুখী করতে চাই। আমার প্রতিজ্ঞা, তোমাকে আমি যেভাবে হোক সুখী করবো। এবং শুধু তারপরই নিজের কথা ভাববো। আসলে তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমার সুখই আমার সুখ।'

পরপর কয়েকবার বলুন কথাগুলো। তারপর ফিরে আসুন বিটা লেভেলে।

অনুশীলনটা তো পড়লেন। পড়ার সময় যা মনে হলো, তারচেয়ে অনেক, অনেক বেশি শক্তিশালী একটা অভিজ্ঞতা এটা। একটিবার চর্চা করার পরই এর উপকারিতা সম্পর্কে আপনাদের মনে বিশ্বাস জন্মে যাবে। এই অনুশীলনের পদ্ধতিটা আপনারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এক-আধটু হয়ত বদলে নেবেন, তাতে কোনো ক্ষতি

নেই। আপনাদের দু'জনের মধ্যে যদি নির্দিষ্ট কোনো সমস্যা থাকে, সাজেশন দেয়ার সময় সেটার সমাধানও চাইতে পারেন।

বিটা লেভেলে মনের মিল ততোটা শক্তিশালী হতে পারে না। শত বিপদেও ছিঁড়বে না, এই রকম শক্ত বাঁধন যদি চান, ধ্যানমগ্ন হয়ে পরস্পরের মনের মিল ঘটান। দেরি করবেন না।

এগারো

ই. এস. পি. প্র্যাকটিস

ই. এস. পি. মানে এক্সট্রাসেনসরি পারসেপশন।

ই. এস. পি. কি সত্যি আছে? আজ প্রায় সব অভিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করেন, হ্যাঁ, সত্যি আছে। সম্ভাব্যতার নিরিখে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে, পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যম ছাড়াও অন্য মাধ্যমের সাহায্যে তথ্য পাওয়া সম্ভব, আমরা পাই। এই তথ্য অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ থেকে আসতে পারে। আসতে পারে কাছাকাছি কোথাও বা বহু দূর থেকে। সময়, মহাশূন্য বা অন্য কিছুই এর আসার পথে বাধা হতে পারে না।

ই. এস. পি.-এর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে 'অনুমান করো' ধরনের অনুশীলনের মধ্যে যাবো না। এ-ধরনের অনুশীলন করানো হয় মানুষ অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী কিনা প্রমাণ করার জন্যে। কিন্তু আমাদের প্রমাণ করার দরকার নেই, আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, মানুষের ওই ক্ষমতাটা আছে। কাজেই নিজেদের জন্যে আরো বড় কাজ বেছে নেবো আমরা। সেই কাজটা কি? কাজটা হলো, বাস্তব জীবনের সাথে অতীন্দ্রিয় জগতের সমন্বয় ঘটানো। আমরা এর সাহায্যে এমন সব কাজ করতে চাই যা আমাদের বাস্তব জীবনে উপকার বয়ে আনবে।

এই বইতে যতোগুলো টেকনিক দেয়া আছে সেগুলো চর্চা করে দক্ষতা অর্জন করে থাকলে আপনি ই. এস. পি. চর্চা করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। মনের গভীর স্তরে চলে গিয়ে আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা সম্ভব হবে, সেই সাথে মনের পর্দায় বস্তু এবং ঘটনার ছবি চাক্ষুষ এবং উপলব্ধি করতে পারবেন। এই দুটো হলো অতীন্দ্রিয় জগতে ঢোকার দরজা।

বিদেশে অনেক স্কুল আছে যেখানে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়, সেই সাথে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ই. এস. পি.-ও চর্চা করানো হয়। মনকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি আয়ত্ত করার পর অতীন্দ্রিয় লেভেলে বিচরণ শুরু করে তারা-শরীরের বাইরে আরোপ করে তাদের সচেতনতা। একে বলে এক্সট্রা সেনসরি প্রজেকশন।

মনের পর্দায় ছবি দেখার সহজ পদ্ধতি দিয়ে শুরু করে তারা। অত্যন্ত গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পৌঁছে যে যার বাড়ির সামনে দেখতে পায় নিজেদের। নিজেদের ওখানে দেখতে পাওয়া সম্ভব করে তুলতে কল্পনার আশ্রয় নেয় তারা। সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে লিভিং রুমে দক্ষিণ দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াবার আগে গভীর একাগ্রতার সাথে একটাই কাজ করতে হয় তাদেরকে, বাড়ির সামনে যা যা আছে সব অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করা। প্রথমে এই কামরাটাকে রাতের বেলা আলো জ্বালা অবস্থায় দেখে, তারপর দেখে দিনের বেলা, যখন জানালা দিয়ে রোদ আসছে। এই ঘর সম্পর্কে যা যা মনে পড়ে, সব দেখতে হয় তাদেরকে। এরপর তারা দক্ষিণ দেয়াল স্পর্শ করে, এবং ঢুকে পড়ে দেয়ালের ভেতর।

অনেকের কাছে ব্যাপারটা অবাস্তব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু মনের পর্দায় ছবি দেখায় যারা দক্ষতা অর্জন করেছে তাদের কাছে সম্পূর্ণ বাস্তব একটা ব্যাপার এটা।

দেয়ালের ভেতর জায়গাটা এমন একটা জায়গা যেখানে জীবনে কখনো আসেনি তারা, তাই আলো দেখে, গন্ধ শুঁকে, উত্তাপ অনুভব করে এবং দেয়ালের বাইরের দিকে টোকা দিয়ে দেয়ালের নিরেট-টত্বসহ নতুন পরিবেশটাকে তারা পরীক্ষা করে নেয়। দেয়ালের বাইরে আবার বেরিয়ে এসে দেয়ালের দিকে মুখ করেই দাঁড়ায় তারা, তারপর ওটার রঙ বদলে একবার কালো, একবার লাল, একবার সবুজ, একবার বেগুনি এবং সব শেষে ওটার নিজস্ব রঙে ওটাকে দেখে। এরপর তারা একটা চেয়ার তুলে নিয়ে—এই পরিস্থিতিতে যার কোনো ওজন নেই—দেয়ালের পাশে রেখে আবার একবার দেয়ালের রঙ বদলের সাথে সাথে চেয়ারটার আকার আকৃতি বা রঙের কি পরিবর্তন হয় না হয় লক্ষ্য করার জন্যে বিশেষ মনোযোগ দেয়। শুধু চেয়ার নয়, এই অনুশীলন তারা একটা তরমুজ, একটা লেবু, একটা কমলা, তিনটে কলা, তিনটে গাজর এবং শাক-সব্জির সাহায্যেও চর্চা করে।

এই অধিবেশন শেষ হওয়া মানে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ নেয়া হয়ে গেল। যুক্তিবাদী মনকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে পিছনের আসনে, আর কল্পনাপ্রবণ মনটাকে এগিয়ে নিয়ে এসে বসানো হয়েছে সামনের আসনে, যেখানে কন্ট্রোল প্যানেল রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের যুক্তিবাদী মন তাদেরকে বলে, 'না, এসব কথা আমাকে বলো না! একটা দেয়ালের ভেতর ঢুকেছো বা এই রকম অবাস্তব আর কোথাও গেছো, এ আমি বিশ্বাস করি না। তুমি ভালো করেই জানো, এ সম্ভব নয়। তুমি আসলে এখানেই বসে আছো।'

কিন্তু কল্পনাপ্রবণ মন, পর্দায় ছবি দেখতে যে দক্ষতা অর্জন করেছে, যুক্তিবাদী মনের এই কথা অগ্রাহ্য করতে পারবে। কল্পনাশক্তি যতই জোরালো হয়ে উঠবে, ততোই শক্তিশালী হয়ে উঠবে অতীন্দ্রিয় (সাইকিক) ক্ষমতা। এই ক্ষমতাটা চুপি চুপি গা ঢাকা দিয়ে থাকে কল্পনাপ্রবণ মনের ভেতরই।

পরবর্তী অধিবেশনে ছাত্র-ছাত্রীরা কল্পনা আর মনের পর্দার সাহায্য নিয়ে নিজেদেরকে ধাতব পদার্থের ভেতর প্রবেশ করায়। এই ধাতব পদার্থ হতে পারে লোহা, স্টেনলেস স্টীল, সীসা, তামা বা পিতল। এসবের ভেতর ঢুকে আগের মতোই তারা আলো, গন্ধ, রঙ, টেমপারেচার এবং নিরেটত্ব পরীক্ষা করে। কাজগুলো দ্রুত সারতে

চেষ্টা করে তারা, যাতে যুক্তিবাদী মন কাছে ঘেঁষতে না পারে।

প্রথম দিকে তারা ধাতুর তৈরি সহজ সরল আকার আকৃতির জিনিসের ভেতর ঢোকে, তারপর ধীরে ধীরে বেছে নেয় জটিল সব জিনিস। প্রথম দিকে হয়ত সিলিণ্ডার, পেরেক, আলপিন বা কিউবের ভেতরে ঢোকে। তারপর হয়ত বেছে নেয়, গ্রিল, তৈজসপত্র, যন্ত্রপাতি, মেশিন ইত্যাদি। এর পর ধাতব পদার্থ ছেড়ে বেছে নেয় ফলবান কোনো গাছ। একটা গাছ চার ঋতুতে চার রকম চেহারা পায়, তার প্রতিটি চেহারাতেই প্রবেশ করে ছাত্র-ছাত্রীরা। ফল এবং পাতার ভেতরও তারা ঢোকে। এর আগে অন্য কিছুর মধ্যে ঢুকে যা যা করেছে তারা, এবারও গাছ, ফল আর পাতার ভেতর ঢুকে ঠিক সেই কাজগুলোই করে। অর্থাৎ গভীর ভাবে অনুভব করে, উপলব্ধি করে এসবকে— ওপর ওপর নয়, একেবারে ভেতর থেকে।

এরপর তারা এক লাফ দিয়ে অনেক সামনে চলে যায়। ঢুকে পড়ে পোষা কোনো প্রাণীর শরীরে।

এই পর্যায় পর্যন্ত এতোই সাফল্যের সাথে কাজগুলো করে তারা, ব্যাপারটা সম্ভব কি সম্ভব নয় এই সন্দেহ প্রায় কারো মনেই আর অবশিষ্ট থাকে না। 'সত্যিই কি এই কাজ করছি আমি?' এই প্রশ্ন মাত্র দু'একজন ছাত্রের মনে উঁকি দেয়। এবার তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে মনের পর্দায় পরীক্ষা করে, খুঁটিয়ে দেখে পোষা একটা প্রাণীকে। এই দেখার সময়ও প্রাণীটির রঙ বারবার বদলে নেয় তারা। এবং তারপর, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে, এবার তারা প্রাণীটির খুলির ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ে তাজা ব্রেনে। ব্রেনটাকে কয়েক মিনিট পরীক্ষা করে বেরিয়ে আসে তারা, বাইরে থেকে প্রাণীটিকে আবার একবার ভালো করে দেখার জন্যে। এবার তারা ওটার শুধু বুক পরীক্ষা করে। পরীক্ষা শেষ করে ঢুকে পড়ে বুকের ভেতর। ওখানে ঢুকে তারা এক এক করে পরীক্ষা করে পাঁজরগুলো, শিরদাঁড়া, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস আর লিভার। বুকের ভেতর জিনিস-গুলো পরীক্ষা করে বেরিয়ে আসে তারা। ইতিমধ্যে জমা হয়েছে অনেকগুলো সাফল্য, সেগুলো পুঁজি করে জীবনের সম্ভবত সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা এবার তারা ঘটাতে যাবে—ঢুকে পড়বে একজন মানুষের শরীরে। কিন্তু তার আগে প্রস্তুতি নিতে হয় ওদেরকে।

ধ্যানের বিশেষ গভীর একটা স্তরে পৌঁছে, কখনো থিটার নিচের লেভেলও হতে পারে সেটা, উজ্জীবিত কল্পনাশক্তির সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা মনের পর্দায় তৈরি করে একটা ল্যাবরেটরী। এই ল্যাবরেটরী তাদের পছন্দ আর রুচি অনুসারে যে-কোনো আকারের, যে-কোনো আকৃতির এবং যে-কোনো রঙের হতে পারে। নিজেদের পছন্দ করা ডিজাইন মতো সেই ল্যাবরেটরীতে একটা ডেস্ক আর একটা চেয়ার থাকবে। থাকবে একটা টেবিল বা দেয়াল ঘড়ি। থাকবে একটা ক্যালেণ্ডার, তাতে বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতের তারিখ থাকা চাই। আর, হ্যাঁ, একটা ফাইলিং কেবিনেটও থাকতে হবে। কিন্তু ল্যাবরেটরীতে বেমানান কিছু থাকতে পারবে না। তবে কেউ যদি এক গোছা ফুল রাখতে চান, রাখতে পারবেন। ফুল তো কোথাও বেমানান নয়।

পরবর্তী পদক্ষেপ বুঝতে হলে, আরেকবার উপলব্ধি করা দরকার, আমাদের সাইকিক (অতীন্দ্রিয়) সেনসিং অ্যাপারাটাস ভাষা এবং যুক্তি থেকে কতোটা দূরে,

উপলব্ধি করা দরকার প্রতিবিম্ব আর প্রতীকের কতোটা কাছাকাছি। কারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে মনের পর্দায় তেরি করা ল্যাবরেটরীটাকে 'ইনস্ট্রুমেন্ট' দিয়ে সাজানো। মানুষের শরীরের ভেতর ঢুকে এটা সেটা পরীক্ষা করা অভ্যেস হয়ে যাবার পর একদিন তারা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ একটা কাজে হাত দেবে। কাজটা দু'ভাগে ভাগ করে নেবে তারা। প্রথম কাজ, নির্দিষ্ট একজন মানুষের ভেতর ঢুকে খুঁজে বের করা তার শরীরের ভেতর কোথাও কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে কিনা। কিংবা এমন একজন মানুষের শরীরে ঢুকবে তারা যার শরীরের ভেতর কোনো রোগ আছে বলে আগে থেকেই ধারণা করা যায়। ত্রুটি-বিচ্যুতি আবিষ্কারের পর দ্বিতীয় কাজে হাত দেবে, ইনস্ট্রুমেন্টের সাহায্যে সারিয়ে তুলবে সেই ত্রুটি বা রোগ।

ওদের বেশিরভাগ ইনস্ট্রুমেন্ট দেখতে হবে অদ্ভুত, অন্য কোনো ল্যাবরেটরীতে এসব দেখতে পাওয়া যায় না। এই যন্ত্রপাতিকে সিমবোলিক বা প্রতীকী ইনস্ট্রুমেন্ট বলা যেতে পারে।

ল্যাবরেটরীতে একটা চালুনি বা ঝাঁজরি অবশ্যই থাকবে। এর সাহায্যে তারা রক্তে জমে থাকা দূষিত পদার্থ বা ভেজাল দূর করবে। আরো থাকবে একটা ঝাঁটা। কারো যদি গেঁটেবাত থাকে, অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার সাহায্যে সেটা দেখতে পাওয়া যাবে, তখন ওই ঝাঁটা দিয়ে ঝেঁটিয়ে সেটা দূর করা হবে। ঘা যাতে তাড়াতাড়ি শুকায় তার জন্যে দরকার হবে মলম। আর দরকার হবে ডিসটিলড ওয়াটার, হোস পাইপ। এই দুটো লাগবে অপরাধ-বোধ ধুয়ে সাফ করার কাজে। উত্তেজনা, উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্যে থাকবে প্রচুর ক্যাসেটসহ টু-ইন-ওয়ান বা মিনি ডেক। প্রত্যেকেরই একটা করে ল্যাবরেটরী থাকবে, এবং যে যার ল্যাবরেটরী নিজেই পছন্দমত যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজাবে। যে-কোনো দুই সেট যন্ত্রপাতি কোনো ভাবেই হুবহু এক রকম দেখতে হবে না। ওগুলো তারা সংগ্রহ করবে এমন এক জায়গা থেকে, যেখানে সবকিছুই সম্ভব··· মনের গভীর স্তর। এবং এই সব যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার পর ছাত্র-ছাত্রীরা উপলব্ধি করে, অতীন্দ্রিয় জগতে পৌঁছে তারা যে কাজগুলো করবে সেসব কাজের সুনির্দিষ্ট প্রভাব পড়বে বস্তুগত দুনিয়ায়।

এসব যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার সময়, ছাত্র-ছাত্রীরা পরামর্শদাতার অভাব বোধ করে। সাধারণ লোক বলে মনের ভেতর মন আছে, কখনো বা তার পরিচয় দেয়া হয় এই বলে—'শান্ত নিচু একটা কণ্ঠস্বর'। তারা এই শান্ত নিচু কণ্ঠস্বরের পরামর্শ চায়। তারা অবশ্য এটাকে নিচু কণ্ঠস্বর বলে না, তাদের কাছে ওটা অত্যন্ত জোরালো একটা কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিত। এবং ওই কণ্ঠস্বর একটা নয়, দুটো। ল্যাবরেটরীতে দু'জন পরামর্শদাতা নেয় ওরা। একজন পুরুষ, আরেকজন মহিলা। ওদেরকে আগেই বলে দেয়া হয় ধ্যানমগ্ন হবার পর নিজের ল্যাবরেটরীতে দু'জন পরামর্শদাতা নেবে তারা, কাজেই কাকে কাকে নেবে না নেবে সে-ব্যাপারে আগেই চিন্তা-ভাবনা করে রাখার সুযোগ থাকে তাদের।

এক ছাত্র, পরামর্শদাতা হিসেবে একবার চেয়ে বসলো খোদ আলবার্ট আইনস্টাইনকে। কিন্তু পেলো কাকে জানেন? একজন ভাঁড়কে। লোকটার মুখ ছিলো রঙ করা। নাকের জায়গায় ছিলো গোলাপি রঙের একটা পিং পং বল। যদিও, কার্যক্ষেত্রে

দেখা গেল, যুক্তিসঙ্গত এবং তথ্যমূলক উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে তার জুড়ি মেলা ভার।

আরেকজন ছাত্র, তার নাম স্যাম মেরিল। এই ছাত্রটি নিউ টাইমস পত্রিকায় মন-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখেছিল। মজার ব্যাপার, সে তার ল্যাবরেটরীতে পরামর্শদাতা হিসেবে ঠিক যাদেরকে চেয়েছিল, পেয়েছিলও তাদেরকেই।

ছাত্রটি তার ল্যাবরেটরী বানিয়েছিল বিখ্যাত সাবমেরিন 'নটিলাস'-কে। এবার মেরিলের নিজের ভাষায় শুনুন, 'ছোটো একজন মানুষ, পরনে জানু পর্যন্ত ঢিলা লম্বা পায়জামা আর সিল্কের শার্ট, উদয় হলো ডিকমপ্রেশন চেম্বার থেকে। রোগা-পাতলা মানুষ, হরিণের মতো মায়াভরা চোখ কোটরে একেবারে ভেতরে সেঁধিয়ে আছে। দেখেই চিনতে পারলাম, আমার পরামর্শদাতা আর কেউ নন, স্বয়ং উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। হাত নেড়ে আমি বললাম, হাই! কিন্তু উত্তর করলেন না তিনি।··· শরীর-হীন একটা কণ্ঠস্বর থেকে ঘোষণা বেরিয়ে এলো, আমরা তীরে যাচ্ছি। আমি আর উইল একটা হ্যাচওয়ে থেকে লাফ দিয়ে পড়লাম নির্জন সৈকতে। ওখানেই দেখলাম আমার দ্বিতীয় পরামর্শদাতাকে। পরামর্শদাতা নয়, দাত্রী। উনি আর কেউ নন, সোফিয়া লরেন। সবেমাত্র তিনি সাঁতার কেটে তীরে উঠেছেন, তাঁর সুতী টি-শার্ট চামড়ার সাথে একেবারে সেঁটে আছে। প্রথমে তিনিও আমাকে কোনো পাত্তা দিলেন না, কিন্তু শেক্সপিয়ারকে দেখতে পেয়ে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। তাঁরা করমর্দন করলেন, কুশলাদি বিনিময় করলেন, তারপর দু'জনেই পড়ে গেলেন বালির ওপর। ওখানে তাঁরা ছটফট করতে লাগলেন, ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ বেরিয়ে আসতে লাগলো তাঁদের নাক-মুখ থেকে।'

পরদিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করতে হবে। স্যাম মেরিলের ওরিয়েন্টো-লজিস্ট তাকে ফ্লোরিডার এক বাষট্টি বছরের বুড়ির নাম বললো। দুই পরামর্শদাতা, যাঁরা নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত, খেলাচ্ছলে একবার পরীক্ষা করলেন বুড়িকে, তারপর নিজেদের কাজে চলে গেলেন।

পরামর্শদাতারা তাহলে কি পরামর্শ না দিয়েই চলে গেলেন? না। মেরিল দেখলো, মহিলার পেট বলে কিছু নেই, সম্পূর্ণটাই গায়েব হয়ে গেছে। তার জায়গায় লালচে রঙের এক প্রস্থ নাড়ি দেখা যাচ্ছে, ঠিক যেন নিওন বাতি, বিপদ সংকেতের মতো বারবার জ্বলছে আর নিভছে। পরে মেরিল তার ওরিয়েন্টোলজিস্টের কাছ থেকে জানলো, বৃদ্ধা মহিলা নাড়িতে তীব্র জ্বালা নিয়ে হাসপাতালে রয়েছেন।

মনকে যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করা শিখবেন তাঁদের কাছে এই পরামর্শদাতারা অত্যন্ত বাস্তব হয়ে উঠতে পারে। আসলে, কারা এরা? এর সঠিক উত্তর এখনো জানা সম্ভব হয়নি। হয়ত আদর্শ কল্পনার ফসল-অলীক উদ্ভাবন। হয়ত মনের ভেতর যে মন বা অন্তরের ভেতর যে কণ্ঠস্বর (ইনার ভয়েস) আছে তারই মূর্তি। কিংবা আত্মারই প্রতি-ছবি। অথবা অন্য কিছু। শুধু জানা গেছে যে পরামর্শদাতাদের সাথে পরিচয় এবং কাজ করতে শেখার পর, ওদের সাথে সম্পর্কটা হয়ে ওঠে সম্মানজনক। অচিরেই প্রমাণ হয়ে যায় এই সম্পর্ক একটা অমূল্য সম্পদ।

খ্রীষ্টের চারশো বছরেরও আগে, গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের একজন পরামর্শদাতা ছিলো। এই পরামর্শদাতার সাথে মন-নিয়ন্ত্রণ চর্চাকারীদের পরামর্শদাতার কিছু অমিল

আছে। সক্রেটিসের পরামর্শদাতা তার উপদেশ শুধু সাবধান করে দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। প্লেটোর কথা অনুযায়ী সক্রেটিস বলেছেন, 'সেই ছোটো বেলা থেকেই আধা–স্বর্গীয় একজনের অস্তিত্ব আমি অনুভব করে আসছি, যার কণ্ঠস্বর আমাকে মাঝে মধ্যেই নির্দিষ্ট কোনো কাজ করতে নিষেধ করে। কিন্তু আমাকে কি করতে হবে, সে–নির্দেশ তার কাছ থেকে কখনোই আমি পাই না।'

আরেকজন লেখক, জেনোফন (XENOPHON) সক্রেটিসের একটা উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন। সক্রেটিস বলেছেন, 'আজ পর্যন্ত এই কণ্ঠস্বরের সাবধানবাণী কখনো ভুল প্রমাণিত হয়নি।'

একটু পরই আপনি একজন ছাত্রকে তার ল্যাবরেটরীতে দেখতে পাবেন। দেখতে পাবেন, সে তার পরামর্শদাতাদের সাথে গোপন পরামর্শ করছে। নিজের এবং অন্যান্য–দের উপকার করার কি যে ক্ষমতা এই ছাত্রের, দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবেন আপনি।

তার আগে দুটো মানসিক অনুশীলন আছে, দুটোই এক বন্ধুর শরীর পরীক্ষা সংক্রান্ত। এই পরীক্ষার সাথে এর আগে করা পোষা প্রাণী পরীক্ষার তেমন কোনো তফাৎ নেই, এক্ষেত্রে শুধু আরো বেশি খুঁটিয়ে সব কিছু লক্ষ্য করতে হবে। কাজগুলো শেষ হলে, ছাত্ররা জোড়া বাঁধে।

প্রতিটি জোড়ার একজনকে বলা হয় সাইকো–ওরিয়েন্টোলজিস্ট, অপরজনকে বলা হয় সাইকিক অপারেটর।

সাইকো–ওরিয়েন্টোলজিস্ট একটা কার্ডে তার চেনা এক লোকের নাম, বয়স, সাধারণত কোথায় কোথায় তাকে দেখতে পাওয়া যায়, এবং তার বড় ধরনের কিছু শারীরিক ত্রুটি বা কষ্ট, এই সব লেখে। এবার সাইকিক অপারেটর, হয় নিজে অথবা তার সাইকো–ওরিয়েন্টোলজিস্টের সাহায্য নিয়ে গভীর লেভেলে চলে যায়, সম্ভবত এই প্রথম এবং শেষবার এই সময় তার আত্মবিশ্বাস দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে।

গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ল্যাবরেটরীতে পৌঁছে পরামর্শদাতাদের সঙ্গ পাবার পর, ইঙ্গিতে জানায় সে, রেডি। এবার সাইকো–ওরিয়েন্টোলজিস্ট তার কার্ডে লেখা নাম, বয়স, এবং লোকটাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে, ইত্যাদি পড়ে শোনায়। এই লোকের সাথে কখনো পরিচয় হয়নি সাইকিক অপারেটরের, কিংবা এই লোকের কথা কারো মুখে শোনেওনি কখনো। তার কাজ হলো, লোকটার কোথায় কি অসুবিধে আছে খুঁজে বের করা।

লোকটার শরীর, ভেতর এবং বাইরে থেকে, পরীক্ষা করে সে। দেয়াল, ধাতব পদার্থ, পোষা প্রাণী ইত্যাদি আগেই পরীক্ষা করে দক্ষতা অর্জন করেছে সে, পদ্ধতিটাও অভ্যেস হয়ে গেছে, কাজেই এই লোকের ভেতর–বার পরীক্ষা করতে কোনো অসুবিধে হবার কথা নয় তার, হয়ও না। পরীক্ষার সময় প্রয়োজনে পরামর্শদাতাদের সাথে আলোচনা করে সে। হয়ত কথা বলে লোকটার সাথেও।

সাইকিক অপারেটর তার কাজে কিভাবে এগোচ্ছে, জানার জন্যে সাইকো–ওরিয়েন্টোলজিস্টের কাছ থেকে অনুরোধ আসে, 'থেমো না, কথা বলতে থাকো, যদি মনে হয় অনুমান করছো, তবুও।' এ–ধরনের একটা অধিবেশনে সাধারণত যা ঘটে, নিচে তা তুলে দেয়া হলো (এটা একটা বাস্তব অধিবেশনের অংশবিশেষ)ঃ

সাইকো-ওরিয়েন্টোলজিস্টঃ আমি এই কার্ডে জন সামার্স নামে এক লোকের নাম লিখে রেখেছি। তার বয়স আটচল্লিশ, ইণ্ডিয়ানার এল্কহার্টে বাস করে। এক—দুই—তিন—ইণ্ডিয়ানা এল্কহার্টের জন সামার্স এখন তোমার পর্দায় চলে এসেছে। চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করো তাকে, অনুভব করো, দেখো, কল্পনা করো, তৈরি করো, জানো সে ওখানে আছে, নিঃসন্দেহে ধরে নাও সে ওখানে আছে। তোমার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে শরীরটা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করো। তুমি জানো মাথাটা কোথায় থাকতে পারে, সেখান থেকে শুরু করো। তুমি জানো পা কোথায় থাকতে পারে, সেখানে পৌঁছে শেষ করো। এইভাবে, একবার, দু'বার, অনেক বার—প্রতি সেকেণ্ডে একবার করে।

'এই ভঙ্গিতে শরীরটা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করার সময়, বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে এই রকম তিনটে অংশ নির্বাচন করার অনুমতি দাও তোমার কল্পনাকে। প্রতি সেকেণ্ডে একবার করে শরীর পরীক্ষা করাটা চালিয়ে যাও, এবং বিশেষ ভাবে যে অংশগুলো তোমাকে আকৃষ্ট করছে সেগুলোর কথা জানাও আমাকে। তোমার হয়ত মনে হবে, যেন নিজে থেকে বানাচ্ছো, তবু তোমার মাথায় যা আসে বলো আমাকে।'

সাইকিক অপারেটরঃ 'তার ডান কাঁধটা একটু নিচু হয়ে আছে, সামনের দিকেও ঝুঁকে আছে একটু···বাকি সব ঠিক আছে বলেই মনে হয়, শুধু বাম গোড়ালিটা ছাড়া···এবার বুকের ভেতরটা দেখি···সব কেমন উষ্ণ···ডান দিকে একটু ঠাণ্ডা ভাব···ঠাণ্ডা আর অন্ধকার একটু বেশি এদিকে···আরে, ডান ফুসফুসটা দেখছি নেই···এবার সেই গোড়ালিটা···দেখে তো মনে হচ্ছে ঠিকই আছে, তবে সাদা একটা বাঁকা রেখা দেখতে পাচ্ছি···ঠাণ্ডার দিনে ব্যথা করে···কবে হয়ত ভেঙে গিয়েছিল···বোধহয়, এইটুকুই···থামো, আমার পরামর্শদাত্রী লোকটাকে ধরে ঘোরাচ্ছে, সম্ভবত আমাকে কিছু দেখাতে চাইছে···হ্যাঁ, ইঙ্গিতে লোকটার কানের পিছনটা দেখাচ্ছে সে···হ্যাঁ, গভীর একটা ক্ষত চিহ্ন রয়েছে ওখানে···ওখানে একটা অপারেশন করা হয়েছিল···বেশ গভীর একটা দাগ রয়ে গেছে···ব্যস, আর কিছু বলার নেই আমার।'

সাইকো-ওরিয়েন্টোলজিস্টঃ 'ভেরি গুড। লোকটার ডান ফুসফুস নেই, আর একটা কানের পিছনে গভীর ক্ষতচিহ্ন আছে। গোড়ালি সম্পর্কে এখানে আমার কাছে কোনো তথ্য নেই। এবার, ডান ফুসফুস আর কানের পিছনে গভীর ক্ষতটার কথা যখন তুমি আমাকে বললে তোমার তখনকার অনুভূতি আরেকবার অনুভব করো। এই অনুভূতিটাকে পরবর্তী কেসের জন্যে একটা রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে তুমি।'

এক মুহূর্তের বিরতির পর সাইকিক অপারেটর তার ধ্যান থেকে উঠে এলো বিটায়, হাসছে। 'মাগো! কি অদ্ভুত!'

অদ্ভুত যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই পৃথিবীতে যতো রকমের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাই আমরা, সে-সবের সাথে এর কোনো মিল নেই। তবু, এই মাত্র যে দৃশ্যের বর্ণনা পড়লেন আপনি তার মধ্যে স্বাভাবিকত্ব বলে কিছু নেই। কেউ কেউ তাদের প্রথম কেসে সামান্য এক-আধটুর বেশি দেখতে পায় না, কেউ কেউ আবার প্রথম, দ্বিতীয়

এবং এমনকি তৃতীয় কেসেও বিন্দু-বিসর্গ কিছুই দেখে না। কিন্তু লেগে থেকে চর্চা করে গেলে, একদিন না একদিন সবাই সরাসরি এই অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়, তখন তারা বুঝতে পারে ব্যাপারটা স্রেফ কাকতালীয় নয়,—অত্যন্ত বাস্তব কিছু একটা কাজ করছে এখানে।

অনেক সময় আমরা মনে করি কল্পনার দায়িত্বজ্ঞান বলতে কিছু নেই, যতো সব উদ্ভট আর অর্থহীন চিন্তা-ভাবনার জনক সে। কখনো সখনো তা সত্যি বটে। কিন্তু সুসংহত, সুসংগঠিত কল্পনাই জন্ম দেয় মহৎ শিল্পকর্মের। মানুষ তার সমাজের জন্যে যতো ভালো কাজ করেছে তার একটাও কল্পনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব হতো না। অতীন্দ্রিয় কর্মকাণ্ডের ফলাফলও বিশেষ ভাবে ট্রেনিং পাওয়া কল্পনার ফসল। একজন ছাত্র, প্রথম যখন সে অতীন্দ্রিয় জগতে বিচরণ করতে শুরু করে, তার মনে হয় যা সে দেখছে সবই স্রেফ তার কল্পনা। সেজন্যেই সাইকো-ওরিয়েন্টোলজিস্ট তাকে বলে, 'থেমো না, কথা বলতে থাকো, যদি মনে হয় অনুমান করছো, তবুও।' থামতে নিষেধ করা হয় এই কারণে যে তার যুক্তিবাদী মন তার নিজের মানদণ্ডে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার সুযোগ পেয়ে যাবে, দমিয়ে রাখবে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাটাকে, দৈনন্দিন জীবনে যা সে করে অভ্যস্ত।

প্রথম সাফল্য অর্জিত হলে ছাত্রটি জানতে পারে, যা সে দেখছে একে শুধু কল্পনা বলা যায় না। সে কল্পনা করছে, এবং মনে যে জিনিসটা প্রথম আসে তার ওপর আস্থা আর বিশ্বাস রাখতে শিখছে। এভাবেই অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ফসল আসতে শুরু হয়।

এখানে আসলে কাজ করছে প্রকৃতির নিখুঁত আইন। মানুষের মন মানুষের মাথার ভেতর বন্দী নয়। সে বেরিয়ে আসে। তার এই বেরিয়ে আসাটা সুষ্ঠু এবং নির্বিঘ্ন করার জন্যে তাকে বাসনার দ্বারা উজ্জীবিত, বিশ্বাসের দ্বারা উৎসাহিত এবং প্রত্যাশার দ্বারা উদ্বেলিত করতে হবে।

প্রথম কেসে ছাত্রদের প্রত্যাশা খুব বেশি একটা থাকে না। তাকে যদি আদৌ জানানো হয়ে থাকে এবং সে যদি মুক্তমনের অধিকারী হয়, তাহলে তার ভালো করেই জানা আছে যে ই. এস. পি. বলে একটা ব্যাপার আছে, কিন্তু এতোদিন তাকে শেখানো হয়েছে ওটা আর কারো ক্ষমতা, তার নয়। কিন্তু এই ভুল যখন ভাঙে, প্রথমবার যখন সে সফল হয়, তখন তার প্রত্যাশা লাফ দিয়ে বেড়ে ওঠে, সমস্ত সংশয় কাটিয়ে উঠে রওনা হয়ে যায় নিজের পথে।

'আমি তো দেখছি, ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায়ই রোগ ধরতে পারছে,' লিখেছেন মিড-নাইটের বিল স্টার। তাঁর প্রবন্ধটার নাম ছিলো, "মাইণ্ড কন্ট্রোল ক্লাসেস ক্যান ইমপ্রুভ ইওর মেন্টাল পাওয়ার"। এই প্রবন্ধে একটা কঠিন কেসের কথা বর্ণনা করেছেন তিনি। ঘটনার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি বা আর কেউ রোগটা কি তা জানতেন না। তাঁর ধারণা ছিলো, এই কেসের উপসর্গ দেখে রোগ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন হবে।

এর আগে, সেদিনই সকালে, মি. থমাস নামে একজন ছাত্র তাঁর ছেলেকে দেখার জন্যে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। কামরায় আরেকজন রোগী ছিলো। মি. থমাস এই রোগীর নাম ছাড়া আর কিছুই জানতে পারেননি।

সাইকিক অপারেটর সেই রোগী সম্পর্কে কি কি জানতে পারে, এখানে তার

বিবরণ দেয়া হলো।

১। কেসের ডান পা এক রকম বলতে গেলে প্যারালাইজড হয়ে গেছে।

২। হাত আর কাঁধ আড়ষ্ট।

৩। পিছনের কয়েকটা হাড় ক্ষয়ে গেছে, সম্ভবত কোনো রোগ হয়েছিল।

৪। কেসের গলায় ঘা আছে।

৫। পেটে জ্বালা-পোড়া হয়।

৬। সে সাড়ে পাঁচ ফিট লম্বা। একশো পাঁচ পাউণ্ড ওজন।

হাসপাতালে ফিরে এলেন মি. থমাস। এখানে এসে রোগী আর তার ডাক্তারের সাথে কথা বলে তিনি জানতে পারলেন, রোগী ছোটোবেলায় একবার পোলিও-য় আক্রান্ত হয়েছিল। একবার হুইল চেয়ার থেকে পড়ে গিয়ে শিরদাঁড়া আর ডান কোমরে আঘাত পেয়েছিল। আর সব ব্যাপারেও সাইকিক অপারেটর যা যা বলেছে, সব ঠিক—শুধু গলার ক্ষত আর পেটে জ্বালা-পোড়া বাদ। ওগুলো মি. থমাসের ছেলের রোগ।

প্রথমদিকে এই রকম ছোটোখাটো ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে। তার জন্যে ঘাবড়াবার কিছু নেই। চর্চা করতে করতে লক্ষ্যভেদে নৈপুণ্য এসে যায়, তখন আর টার্গেট মিস হয় না।

আরো চর্চা করার পর সাইকিক অপারেটর শুধু মানুষের রোগ নয়, যে-কোনো বস্তুর বৈশিষ্ট্য বা তার অবস্থানও নির্ণয় করতে পারবে।

ডিক মাজা, নিউইয়র্কের একজন অভিনেতা-গায়ক। লেখক এবং প্রকাশকদের পাণ্ডুলিপি টাইপ করে দিয়ে কিছু উপরি রোজগার করে সে। একদিন একটা সর্বনাশ ঘটে গেল, অত্যন্ত মূল্যবান একটা পাণ্ডুলিপি হারিয়ে ফেললো সে। উদভ্রান্তের মতো সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজলো, কিন্তু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেল না। একজন ছাত্রের সাথে পরিচয় ছিলো তার, উন্মাদের মতো চেহারা নিয়ে হাজির হলো তার কাছে। সমস্যাটা কি শোনার পর ছাত্রটি তাকে সাহায্য করতে রাজি হলো।

রিহার্সেল দেয়ার জন্যে ছোটো একটা চার্চ অডিটোরিয়ামে ঢুকেছিল সে, মনে আছে ঢোকার সময় পাণ্ডুলিপিটা তার হাতেই ছিলো। ওই সময় যুবকদের একটা দল বেরিয়ে যাচ্ছিলো চার্চ থেকে, গ্র্যাজুয়েশন এক্সারসাইজের জন্যে এসেছিল তারা। পাণ্ডুলিপিটা ছিলো একটা সাদা এনভেলাপের ভেতর, এনভেলাপে ডিকের নাম ঠিকানা লেখা ছিলো, আর চার অক্ষরের একটা শব্দ—আর-ইউ-এস-এইচ।

ছাত্রটির পরামর্শদাতাদের মধ্যে একজন, মহিলাটি, ছিলেন বোবা। হ্যাঁ এবং না সূচক ভঙ্গিতে মাথা দোলাতেন তিনি, মাঝে মধ্যে আকার-ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করতেন। পুরুষ পরামর্শদাতা ভদ্রলোক প্রয়োজনে এই সব আকার-ইঙ্গিতের ব্যাখ্যা করে দিতেন। তিনি নিজে তো পরামর্শ দিতেনই।

ডিকের বর্ণনা অনুযায়ী পাণ্ডুলিপিটা মনের পর্দায়, ল্যাবরেটরীতে চাক্ষুষ করলো ছাত্রটি। বিরাট একটা ডেস্ক দেখতে পেলো সে, ডেস্কের ওপর অগোছাল হয়ে রয়েছে রাজ্যের কাগজ-পত্র, সেই কাগজ-পত্রের স্তূপে পড়ে রয়েছে ডিকের পাণ্ডুলিপি।

'পাণ্ডুলিপিটা ওখানে কি নিরাপদ?' তার মহিলা পরামর্শদাত্রীকে জিজ্ঞেস করলো

ছাত্র।

মহিলা নিঃশব্দে মাথা কাত করে জানালেন, হ্যাঁ।

'যারা আজ গ্র্যাজুয়েশন এক্সারসাইজের জন্যে চার্চে গিয়েছিল, পাণ্ডুলিপিটা কি তাদের কারো কাছে রয়েছে?'

না।

'ওই ডেস্কটা কি চার্চে?'

না।

'পাণ্ডুলিপিটা কি অচিরেই ফেরত দেয়া হবে?'

হ্যাঁ।

'পাণ্ডুলিপিটা এখন কার কাছে রয়েছে?'

মহিলা পরামর্শদাত্রী হাত তুলে ছাত্রটিকে দেখালো।

'আমার কাছে আছে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলো ছাত্র।

না।

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার জন্যে এবার এগিয়ে এলেন পুরুষ পরামর্শদাতা। 'উনি বলতে চাইছেন, পাণ্ডুলিপিটা আপনার বয়েসী একজন ভদ্রলোকের কাছে আছে। ভদ্রলোক এক যুবতী মেয়েকে নির্দেশ দেন, তার সব কাগজ-পত্র যেন তুলে নিয়ে গিয়ে অফিসে রাখা হয়, কারণ ছাত্রদেরকে সাথে নিয়ে তিনি অন্য এক জায়গায় চলে যাচ্ছেন। যুবতী মেয়েটি তার সব কাগজ-পত্রের সাথে ভুল করে পাণ্ডুলিপিটাও তুলে নিয়ে গেছে। ভদ্রলোকের ডেস্কে রয়েছে সেটা, দেখতেই পাচ্ছেন। চিন্তার কিছু নেই, ভদ্রলোক ওটা দেখলেই ডিকের কাছে ফেরত পাঠাবেন।

দু'দিন পর চার্চের ওই শিক্ষক ভদ্রলোক ডিককে টেলিফোন করলেন। পাণ্ডুলিপিটা কিভাবে তাঁর অফিসের ডেস্কে এলো, ডিককে তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। তাঁর ব্যাখ্যা আর ছাত্রটির পরামর্শদাতার ব্যাখ্যা, দুটোর মধ্যে কোনো অমিল খুঁজে পাওয়া গেল না।

কারো কারো মতে, এ-ধরনের কেস নিয়ে কাজ করে যে রেজাল্ট পাওয়া যায় সেটা পর্যালোচনা করলে কারো বুঝতে বাকি থাকার কথা নয় যে গোটা ব্যাপারটাই আসলে থট ট্র্যান্সফারেন্স।

তাই কি?

এর আগে উদাহরণ হিসেবে যে কেসটা ব্যবহার করেছি—যার একটা ফুসফুস ছিলো না—ওটা একটা বাস্তব কেস ছিলো। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, সাইকিক অপারেটর ভাঙা গোড়ালির কথা বললেও, সাইকো ওরিয়েন্টোলজিস্ট তাকে জানালো, গোড়ালি সম্পর্কে এখানে তার কাছে কোনো তথ্য নেই।

পরে, যার কেস নিয়ে পরীক্ষা চালানো হচ্ছিল, তার সাথে যোগাযোগ করে জানা যায়, বেশ অনেক বছর আগে সে তার গোড়ালি ভেঙে ফেলে, ঠাণ্ডার দিনে খুব কষ্ট দেয় এই ভাঙা গোড়ালি। থট ট্র্যান্সফারেন্স? থট ট্র্যান্সফারেন্স বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি, সে অর্থে নয়। ওরিয়েন্টোলজিস্টের মাথায় চিন্তাটা ছিলো না, কারণ ভাঙা গোড়ালি

সম্পর্কে কিছুই জানতো না সে। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে কেসের মনেও চিন্তাটা ছিলো কিনা সন্দেহ আছে।

আপনি প্রতিবাদ করে বলতে পারেন, লোকটার মনে চিন্তাটা হয়তো ছিলো। হ্যাঁ, হয়তো।

আরেকটা কেস। এক ছাত্র কেসটা নিয়ে কাজ করার সময় জানালো, এক মহিলার কনুইয়ে একটা দাগ রয়েছে, ওখানে হাড় ফেটে যাওয়ায় দাগটা হয়েছে। ওরিয়েন্টো-লজিস্টের কাছে এ-বিষয়ে কোনো তথ্য ছিলো না, তাই মহিলার সাথে যোগাযোগ করতে হলো তাকে। মহিলা তাকে জানালো, না, কনুইয়ে তিনি কখনো ব্যথা পাননি। এর দিন কয়েক পর মহিলা ব্যাপারটা তার মাকে জানায়। মা তখন বললেন, হ্যাঁ, ছোটোবেলায়, তিন বছর বয়সে, পড়ে গিয়ে কনুইয়ে ব্যথা পেয়েছিল সে। এ কি থট ট্র্যান্সফারেন্স?

পরীক্ষায় দেখা গেছে, বড়দের চেয়ে ছোটোদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বেশি। বিটা লেভেলে কি সম্ভব তার একটা সীমা দেয়া আছে। এই সীমা গ্রাহ্য করার মধ্যে ছোটোরা নেই। বিটা লেভেলে যেটাকে অসম্ভব বলে মনে করা হয়, ছোটোরা সেটাকে নিঃসংশয়ে সম্ভব বলে বিশ্বাস করে বসে থাকে। তাছাড়া, বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের চেতনা এখনো এতোটা প্রখর হয়নি যে শুধুমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাপারগুলো বিশ্বাস করবে।

এখানে একটা এক্সপেরিমেন্ট সম্পর্কে বলা হলো।

দুই বাচ্চা, টিমি আর জিমি। মূল অনুশীলনগুলো চর্চা করানো হয়েছিল ওদেরকে। দু'জনকে দুটো আলাদা ঘরে রাখা হলো, প্রত্যেকের সাথে থাকলো একজন পরীক্ষক, যাকে ওরিয়েন্টোলজিস্ট বলা হয়। জিমিকে বলা হলো, নিজের লেভেলে চলে গিয়ে তার যা খুশি, কল্পনার সাহায্যে কিছু একটা তৈরি করুক।

ওদিকে, আরেক কামরায়, টিমিকে বলা হলো, নিজের লেভেলে চলে গিয়ে কল্পনার সাহায্যে দেখো তো, জিমি কি তৈরি করছে।

জিমি তার পরীক্ষককে বললো, 'আমি ছোটো একটা ট্রাক তৈরি করছি। ট্রাকের বডির রঙ সবুজ, চাকার রঙ লাল।'

টিমির পরীক্ষক জানতে চাইলো, 'বলোতো, টিমি, জিমি কি তৈরি করছে?'

'জিমি? ও তো একটা ট্রাক তৈরি করছে।'

'তাই? বেশ বেশ। ট্রাকটা কি রকম দেখতে হচ্ছে, বলতে পারবে?'

'হ্যাঁ। ট্রাকের শরীরটা সবুজ রঙের, চাকাগুলো লাল।'

মন-নিয়ন্ত্রণ শেখার ক্লাসে বড়দের নিয়ে পরীক্ষা চালাবার সময় যে লেভেল ব্যবহার করা হয় এই লেভেল তার চেয়ে অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং গভীর। ছোটোদের মতো গভীর স্তরে যেতে হলে বড়দের অনেক চর্চা দরকার হয়।

এবার একটা কেস বা সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করার অনুশীলন। এখানে শুধু স্বাস্থ্য সমস্যা চিহ্নিত করা হবে। নিচের অনুশীলনটা ওরিয়েন্টোলজিস্টের জন্যে দেয়া হলো। যারা সাইকিক ইনভেস্টিগেশন শিখতে চায়, এই পদ্ধতিতে তাকে শিখতে সাহায্য করবে সে। যারা শিখতে চায় তাদেরকে সাইকিক অপারেটর বলা হয়।

ক-১। তিন—এক বা দশ—এক পদ্ধতির সাহায্যে তোমার লেভেলে এবং তোমার ল্যাবরেটরীতে চলে যাও তুমি।

২। এর আগে কোনো কেস বা সাবজেক্ট নিয়ে যদি নিখুঁত আর সঠিকভাবে কাজ করে থাকো, নতুন একটা কাজে হাত দেয়ার আগে সেই ঘটনাটা ভালো করে পর্যালোচনা করে নাও।

৩। তুমি তৈরি হলে, আমাকে জানাবে (তৈরি হলে, কাজ শুরু করো।)।

৪। একটু পরই তোমাকে আমি একটা সাবজেক্ট সম্পর্কে তথ্য এবং সমস্যা দেবো। নিখুঁত এবং সঠিক উত্তর দিতে হলে নির্দিষ্ট একটা লেভেলে পৌঁছুতে হবে তোমাকে। সেখানে পৌঁছুবার জন্যে তোমাকে সময় এবং সুযোগ দেয়ার উদ্দেশে দশ থেকে এক পর্যন্ত গুণবো আমি। ১০-৯-৮-৭-৬-৫-৪-৩-২-১। এই নির্দিষ্ট লেভেলে তোমার মন এখন নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। একটু পরই তোমাকে আমি একটা সাবজেক্ট সম্পর্কে তথ্য এবং সমস্যা দেবো, এই লেভেল থেকে তুমি নিখুঁত এবং সঠিক উত্তর দিতে পারবে।

খ-১। আমি তিন পর্যন্ত গুণলে তোমার পর্দায় সাবজেক্টের (নাম, বয়স, ঠিকানা, লিঙ্গ উল্লেখ করুন) প্রতিবিম্ব পড়বে।

২। ১-২-৩ (ঝট্ করে আঙুল খাড়া করুন)। তোমার পর্দায় সাবজেক্টের (নাম, বয়স, ঠিকানা, লিঙ্গ) প্রতিচ্ছায়া পড়েছে।

৩। ওটাকে অনুভব করো, (বিরতি) উপলব্ধি করো, (বিরতি) চাক্ষুষ করো, (বিরতি) কল্পনা করো, (বিরতি) তৈরি করো, (বিরতি) জানো সে ওখানে আছে, নিঃসন্দেহে ধরে নাও সে ওখানে আছে।

৪। তোমার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে শরীরটা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করো। তুমি জানো মাথাটা কোথায় থাকতে পারে, সেখান থেকে শুরু করো। তুমি জানো পা কোথায় থাকতে পারে, সেখানে পৌঁছে শেষ করো। এইভাবে, একবার, দুবার, অনেক বার—প্রতি সেকেণ্ডে একবার করে।

৫। এই ভঙ্গিতে শরীরটা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করার সময়, বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে এই রকম তিনটে অংশ নির্বাচন করো (বিরতি)।

৬। প্রতি সেকেণ্ডে একবার করে শরীর পরীক্ষা করার কাজটা চালিয়ে যাও, এবং বিশেষ ভাবে যে অংশগুলো তোমাকে আকৃষ্ট করছে জানাও আমাকে (বিরতি)।

৭। এটা একটা প্র্যাকটিস সেসন। তুমি যা উপলব্ধি আর অনুভব করছো, সব বেরিয়ে আসতে দাও।

৮। তোমার হয়তো মনে হতে পারে, সব নিজে থেকে বানাচ্ছো, তবু তোমার মাথায় যা আসে সব বলো আমাকে।

(এই পর্যায়ে সাইকিক অপারেটরকে কথা বলার জন্যে সব রকম উৎসাহ দিয়ে যান। তিনটে অংশ নির্বাচিত হওয়ার পর আবার শুরু করুন।)

গ-১। আকৃষ্ট করছে এই রকম তিনটে অংশের ওপর সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দাও এবার। এই তিনটে অংশ প্রতি সেকেণ্ডে একবার করে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করো। এই তিনটের যে অংশটা সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে সেটাকে চিহ্নিত করো।

(একটা অংশ চিহ্নিত করা হয়ে গেলে, তারপর আবার শুরু করুন।)

২। চিহ্নিত করা অংশটাকে প্রতি সেকেণ্ডে একবার তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করো। এই অংশের কোন্ বিশেষ জায়গাটা তোমাকে টানছে লক্ষ্য করো। সেই জায়গাটা চিহ্নিত করো।

(জায়গাটা চিহ্নিত করা হয়ে গেলে, তারপর আবার শুরু করুন।)

৩। নির্বাচিত এই জায়গাটা নিজের সুবিধে মতো আকারে বড় করে নাও। এই জায়গায় যদি কোনো ক্রুটি বা অসুবিধে থাকে, তোমার মনকে বলো সেটা যেন ধরতে পারে, চিহ্নিত করতে পারে। মনে রেখো, সমস্যাগুলো একবার ধরতে পারলে সেগুলো তুমি সমাধান করতে পারবে।

৪। তদন্ত চালিয়ে যাও, সেই সাথে কথাও বলতে থাকো। তোমার যা বলতে ইচ্ছে করে, সব বলো আমাকে। কোনো কথা, তা যতোই হাস্যকর আর অপ্রাসঙ্গিক হোক, চেপে রেখো না। তোমার হয়তো মনে হচ্ছে, যা বলতে চাইছো তা সবই তোমার নিছক কল্পনা, বাস্তব নয়। আসলে, ঠিক এই অনুভূতিটাই তোমার হওয়ার কথা আর দরকার। সত্যি–মিথ্যে, আসল–নকল, ভুল–নির্ভুল—এসব ভাবতে যেয়ো না। তোমার মনে যা আসছে তাই বলো আমাকে।

(ওরিয়েন্টোলজিস্টের উদ্দেশে কয়েকটা কথাঃ তথ্যগুলো অধিবেশনের আগেই আপনাকে লিখে রাখতে হবে। শুরুতে যাই বলুক সাইকিক, আরো বলতে উৎসাহ দিন তাকে। সম্পূর্ণ রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত ভালো বা মন্দ কিছুই বলবেন না। সম্পূর্ণ রিপোর্ট পাবার পর, সাইকিক বিটা লেভেলে উঠে আসার আগেই তার সাথে আপনার লেখা তথ্য এবং তার আবিষ্কার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। যে ক'টা বিষয়ে সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে সে সেগুলোকে এক একটা রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে গণ্য করতে হবে। একটা করে সঠিক উত্তর বেছে নিন, এবং সাইকিককে বলুন, এই উত্তরটি দেয়ার সময় তার যেসব অনুভূতি হয়েছিল সেগুলো আবার একবার অনুভব করুক সে, অর্থাৎ ঘটনাটির আবার একবার পুনরাবৃত্তি করুক সে। এবার তার ভুলগুলো সম্পর্কে। তার উত্তর সঠিক হয়নি, সরাসরি এ–কথা বলার দরকার নেই। বলবেন, 'এ–ব্যাপারে আমার কাছে কোনো তথ্য নেই, তোমার কথা ঠিকও হতে পারে।' আর, প্রতিটি উত্তরই যদি ভুল হয় বা আপনার লেখা তথ্যের সাথে না মেলে, মনে করতে হবে সাইকিক অন্য কোনো লোককে পরীক্ষা করেছে। সেক্ষেত্রে অন্য একটা কেস নিয়ে আবার নতুন করে অধিবেশন বসা দরকার। যে–সব সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবে সাইকিক, তাকে দিয়ে সেগুলো সংশোধন করিয়ে নিতে যেন ভুল না হয়। এই কাজ বিটায় উঠে আসার আগেই করতে হবে তাকে। তাকে বলবেন, 'তোমার মনের পর্দায় লোকটার সুস্থ, সবল এবং হাসিখুশি ছবি দেখতে ভুলো না। মনে মনে কামনা করো এবং বলো, তুমি সুস্থ থাকো, সবল থাকো, আনন্দে থাকো।' নিচের কথাগুলো সাইকিককে বলতে হবে জোর গলায়, অধিবেশন শেষ করার আগে।)

ঘ–১। মানবাত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়ে যখনই তুমি মনের এই গভীর স্তরে নেমে আসবে, এখন যেমন এসেছো, তখনই তোমার নিজেকে সাহায্য করা হবে। তোমার মেধা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে, এবং প্রতিবার আরো বেশি সঠিক হবে

তোমার উত্তর। আজকের অধিবেশন এখানেই শেষ হতে যাচ্ছে।

২। ধন্যবাদ। এবার তুমি বিটা লেভেলে উঠে আসতে পারো। ১-২-৩-৪-৫-৬-৭-৮-৯-১০। সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় জেগে উঠেছো তুমি। আগের চেয়ে তাজা এবং ঝরঝরে, সুস্থ এবং সবল লাগছে নিজেকে তোমার। তোমার চোখে, কানে বা মাথায় কোনো অসুবিধে নেই। তোমার শরীরে কোথাও কোনো ব্যথা নেই। তুমি আগের চেয়ে ভালো আছো।

বিশেষ কয়েকটি নীতি

১। এই পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় করে তা ভালো করার জন্যে ওষুধ দেয়া হয় না। সে অধিকার এবং লাইসেন্স শুধু পাস করা ডাক্তারদেরই আছে। এই পদ্ধতিতে দূর থেকে সাইকিক তদন্ত পরিচালনা করা হয়, অস্বাভাবিক কিছু থাকলে তা চিহ্নিত এবং দূর করার জন্যে ব্যবহার করা হয় সাইকিক পাওয়ার।

২। এই পদ্ধতিতে একজন লোকের উপস্থিতিতে তার ওপর সাইকিক তদন্ত চালানো হয় না।

৩। এই পদ্ধতি চর্চার সময় যাঁরা উপস্থিত থাকেন কেস হিসেবে তাঁরা নিজেদের নাম উপস্থাপিত করতে পারেন না।

৪। এই পদ্ধতি যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা সমস্যা সৃষ্টি করেন না, সমস্যা সমাধান করেন।

৫। একজন লোক যখন তার গভীর লেভেলে রয়েছে, তাকে নেতিবাচক বা না-সূচক সাজেশন দেয়া সম্পূর্ণ নিষেধ।

বারো

একটা দল চাই

ট্রেনিং ক্লাসে ভর্তি হয়ে অনেক সহজে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা অর্জন করা, বাড়ানো, উন্নত করা এবং কাজে লাগানো শেখা যায়। এই বই পড়েও শিখতে পারবেন আপনি, কিন্তু বই পড়ে শিখতে স্বভাবতই একটু বেশি কষ্ট স্বীকার করতে হবে। ধীরে-সুস্থে শিখুন, কিন্তু মাঝখানে বিরতি দেবেন না, কেননা ধারাবাহিকতা নষ্ট হলে যতোটুকু শিখেছেন তার ধার কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটা দীর্ঘ কাল চর্চা করে আয়ত্ত করার বিষয়, কাজেই প্রথম দিকে কোনো ফল না পেলেও নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবেন না। কাজ হবে, এই বিশ্বাস নিয়ে চর্চা করতে থাকুন।

এ পর্যন্ত যে সব অনুশীলন দেয়া হয়েছে তা মূলত আপনার একার চর্চা করার জন্যে। এক কি দু'মাস পর, যখন আপনি দক্ষ হয়ে উঠবেন, কেস নিয়ে কাজ করার জন্যে যোগ্যতা এসে যাবে আপনার। কেস বা সাবজেক্ট নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয়, এর আগের পরিচ্ছেদে বিশদ ভাবে জানানো হয়েছে। ওই পর্যায়ে পৌঁছে, অন্যান্যদের সাহায্য দরকার হবে আপনার। কিন্তু সাহায্য নেবার আগে অনেকগুলো দিক বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে।

এমনকি এই বইয়ের প্রথম অনুশীলন চর্চা শুরু করার আগেই যোগ্য জনা কয়েক বন্ধুকে নিয়ে একটা দল তৈরি করতে পারলে ভালো হয়, যারা আপনার মতোই অনুশীলনগুলো চর্চা করা শিখবে। চর্চার কাজ এগিয়ে চলবে, সেই সাথে যোগাযোগও থাকবে আপনাদের মধ্যে, তারপর সবাই যখন তৈরি হবেন, যখন সত্যি সত্যি সবগুলো অনুশীলনে দক্ষতা এসে যাবে আপনাদের, শুধু তখনই কেস নিয়ে কাজ করার জন্যে জড়ো হবেন এক জায়গায়।

প্রথম অধিবেশনের জন্যে অন্তত পক্ষে একটা পুরো দিন বরাদ্দ করুন।

চারটে কিংবা আরো বেশি ফাইল কার্ড আনতে হবে প্রত্যেককে। প্রতিটি কার্ডের এক দিকে লেখা থাকবে গুরুতর অসুস্থ কোনো লোকের নাম, বয়স, ঠিকানা ইত্যাদি, আরেক দিকে লেখা থাকবে অসুস্থতার বিবরণ। খুঁটিনাটি সহ সব কিছু লিখুন, মিলিয়ে দেখার সময় ওগুলো কাজে লাগবে।

শুরু করবেন ধাতুর ভেতর নিজেকে মানসিকভাবে প্রবেশ করাবার মধ্যে দিয়ে। সাধারণত ধাতব সিলিণ্ডার বা কিউব ব্যবহার করা হয়। রূপো অথবা তামার তৈরি কোনো জিনিস হলেও চলে, তা নয়তো এক টুকরো সোনার পাত সংগ্রহ করুন। সোনার পাতের চেয়ে আঙটি যোগাড় করা সহজ, তাই করুন। আর লোহার জন্যে যোগাড় করুন এক টুকরো চুম্বক। এগুলো প্রত্যেকটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে নেবেন আগে, তারপর তিন—এক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে চলে যাবেন নিজের লেভেলে। লেভেলে চলে গিয়ে একেকবারে একটা করে জিনিস কল্পনা করুন, নিজের কয়েক ফিট সামনে ওটার ছবি দেখুন, সোজাসুজি সামনের দিকে তাকালে যেখানে দৃষ্টি পড়ে তার চেয়ে একটু ওপরে দেখুন ওটাকে। কল্পনার সাহায্যে জিনিসটাকে আকারে বড় করতে থাকুন, যতোক্ষণ না ওটা প্রায় কামরার আকার পায়। এরপর ওটার ভেতর ঢুকে পরীক্ষা শুরু করুন।

এই একই পদ্ধতিতে কাজ করুন তরি-তরকারি, ফলমূল এবং সবশেষে একটা পোষা প্রাণীর ওপর। হয়তো দেখা যাবে একটা জিনিস পরীক্ষা করে যে ধরনের অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি হলো অন্য একটা জিনিস পরীক্ষা করে সম্পূর্ণ নতুন আরেক ধরনের অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি হলো, দুটোর মধ্যে কোনো মিলই নেই। এটা আপনাদের সবার বেলাই ঘটতে পারে। যদি ঘটে, ব্যাপারটাকে আপনারা সাফল্য বলেই বিবেচনা করতে পারেন। প্রতিটি টেস্টের ফলাফল পরিষ্কার এবং বিশদ হবার দরকার নেই, দরকার হলো একটা জিনিসের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা অন্যান্য জিনিসের অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা হওয়া। আপনার অভিজ্ঞতার সাথে আরেকজনের অভিজ্ঞতা হয়তো একেবারেই মিলবে না। এসবে কিছু এসে যায় না, আসল কথা হলো কি কি

আপনি খুঁজে পেলেন। ওগুলোই আপনার রেফারেন্স পয়েন্ট।

আগের পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা পদ্ধতির সাহায্যে আপনারা প্রত্যেকেই পরামর্শ-দাতাদের ডেকে আনতে সফল হতে পারেন। যদি হন, খুব ভালো কথা। কিন্তু এ-কথা ঠিক যে ওদেরকে ছাড়াও আপনার কাজ চলবে, আপনি এগিয়ে যেতে পারবেন—একটু হয়তো আস্তে-ধীরে, এই যা।

কেস নিয়ে কাজ করার সময় দু'জন করে জোট বাঁধুন। কেস পরিবেশন করার সময় ওরিয়েন্টোলজিস্ট সাইকিক অপারেটরকে কি বলবে, আগের পরিচ্ছেদে তা দেয়া হয়েছে।

বলেছিলাম, শুরু করার আগে অনেকগুলো দিক বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। সেগুলো কি কি, নিচে দেয়া হলো।

১। শান্ত নিরিবিলি একটা জায়গা বেছে নিন, যেখানে কেউ আপনাদেরকে বাধা দেবে না বা বিরক্ত করবে না।

২। ভালো করে জেনে নিন, দলের সবাই এই বইয়ের সব ক'টা অনুশীলন চর্চা করেছে কিনা, যথাযথ নিয়ম মোতাবেক, এবং সাফল্যের সাথে।

৩। আলোচনা করে আগেভাগেই একমত হয়ে নিন যে রেজাল্ট খারাপ ভালো যাই হোক না কেন, কেউ নিজের সাফল্য নিয়ে গর্ব বা কেউ কারো সাফল্য দেখে ঈর্ষা করতে পারবে না। দলের একজন সম্ভবত আর সবার চেয়ে দর্শনীয় সাফল্য অর্জন করবে—প্রথম দিকে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সে-ই সবার চেয়ে ভালো বা তারই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা সবার চেয়ে বেশি। আসল ব্যাপার, প্রথমবারে সে ভালো করেছে। দ্বিতীয়বার, তারপর তৃতীয়বারও সে ভালো করবে, এমন নাও হতে পারে। সাধারণত দেখা যায়, অনেকেই পাঁচ কিংবা ছয়বারের আগে রেজাল্ট ভালো করতে পারে না। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, যে সবচেয়ে ধীরগতি, পরে দেখা যায় সে-ই সবচেয়ে বেশি সাইকিক পাওয়ারের অধিকারী হতে পারে।

৪। আপনি নিজে যখন সাইকিক অপারেটরের ভূমিকায় থাকছেন, মনের সমস্ত সন্দেহ আর সংশয় একপাশে সরিয়ে রেখে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আপনার কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিন, মনকে অনুমতি দিন যা খুশি তাই অনুমান করার। সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, অতীন্দ্রিয় জগতে বিচরণের সময় যাই পান, যাই দেখেন, যাই করেন, কোনো কিছুকেই যুক্তি দিয়ে বিচার করতে যাবেন না। কার্যকারণ খোঁজার কোনো দরকার নেই। 'দূর, এ সম্ভব নয়!' এ ধরনের কথা যেন ভুলেও মুখ থেকে না বেরোয়। প্রথম যে চিন্তা বা অনুমান মাথায় আসবে সেটাকেই সত্যি এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে মেনে নেবেন, দ্বিতীয় চিন্তাটাকে পাত্তা দেবেন না। কারণ দেখা গেছে, প্রথম চিন্তাটাই বেশিরভাগ সময় সঠিক হয়।

মুখ চালু রাখুন। নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করুন শরীরটা। যা দেখতে পান, গড় গড় করে সব বলে যান।

৫। আপনি যখন ওরিয়েন্টোলজিস্টের ভূমিকায় থাকবেন, সাইকিককে কোনো ইঙ্গিত বা আভাস দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করবেন না। আপনি চান আপনার সাইকিক অপারেটর সফল হোক। 'আবার বুকে ফিরে যাও। ভালো করে দেখো, ওখানে কোনো

ত্রুটি নেই তো?' —এই ধরনের কথা বললে তাকে সাহায্য করা হবে না।

সাইকিককে কখনো বলবেন না যে তোমার ভুল হচ্ছে বা তুমি ভুল করছো। একেবারে শুরুর দিকে, যখন ভুরি ভুরি ভুল-ভ্রান্তি হবার সম্ভাবনা থাকে, প্রায়ই একটা ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। তা হলো, যাকে নিয়ে কাজ করার কথা তাকে না নিয়ে ভুল করে অন্য কাউকে নিয়ে কাজ শুরু করে দেয় সাইকিক। এ-ধরনের ভুল খুব স্বাভাবিক, এবং এটা বড় ধরনের ভুলও নয়, একটু চর্চা করলেই এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। উৎসাহ না দিয়ে ওরিয়েন্টোলজিস্ট যদি উল্টোটা করে, কাজের অগ্রগতি থেমে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। সাইকিক ভুল করলে তাকে শুধু বলুন, 'এ-ব্যাপারে আমার কাছে তথ্য নেই।'

৬। সবাই যখন কেস নিয়ে কাজ করে নিয়মিত সফল হতে শুরু করেন, দলটাকে ভেঙে যেতে না দিয়ে এক রাখতে চেষ্টা করুন। গোটা দল নিয়ে ঘন ঘন সভা করা দরকার। কেস নিয়ে একসাথে কাজ করা দরকার। এভাবে কাজ করতে করতেই একদিন আপনি একটা কেস নিয়ে একা কাজ করার যোগ্য হয়ে উঠবেন। হয়ে উঠবেন প্রচণ্ড অনুভূতিপ্রবণ, এবং তখন শুধু গুরুতর অসুস্থতার খবরই নয়, দৈনন্দিন জীবনের অনেক সূক্ষ্ম খবরও অনায়াসে পেতে শুরু করবেন।

৭। উপস্থিত কাউকে কেস হিসেবে গ্রহণ করবেন না। এটা করা আর দূরের কাউকে নিয়ে কাজ করার মধ্যে আইনগত পার্থক্য আছে। প্রথমটাকে বলা যায় প্রত্যক্ষভাবে রোগ নির্ণয়, যা কিনা আইনত শুধু পাস করা ডাক্তারদেরই করার অধিকার রয়েছে। দ্বিতীয়টাকে বলা যায়, সাইকিক ডিটেকশন—অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা ব্যবহার করে, দূর থেকে ভালো-মন্দ লক্ষ্য করা। এটা করায় আইনগত কোনো বাধা নেই।

৮। যাকে নিয়ে কাজ করছেন, তার শরীরে কোথাও কোনো অস্বাভাবিক কিছু যদি দেখেন, দুঃসংবাদটা তাকে দেবার জন্যে ছুটবেন না। দায়িত্বটা আপনার নয়, তার ডাক্তারের। আপনার দায়িত্ব হলো নিজের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বাড়িয়ে নেয়া, যাতে লোকটাকে এবং অন্যান্যদের এই পন্থায় এবং আইনসঙ্গতভাবে সাহায্য করতে পারেন। আপনার মনের চোখে যে-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়বে সেগুলো আপনি নিজের মন দিয়েই সারাবার চেষ্টা করবেন।

তের

অন্যান্যদেরও সারিয়ে তুলুন

দূর থেকে অচেনা একজন লোকের অসুস্থতা ধরতে পারা বিস্ময়কর একটা ব্যাপার, কিন্তু এখানেই আপনি থেমে যেতে চান না। যেসব শরীরে আপনি আপনার সচেতনতা প্রজেক্ট বা আরোপ করেন সে-সব শরীরের রোগ বা অসুস্থতা সারিয়ে তোলার প্রতিক্রিয়াও আপনি প্রয়োগ করবেন। ডাক্তার-কবিরাজ না হয়ে, কোনো রকম ওষুধ-পত্র ব্যবহার না করে সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-ফকিররা তাঁদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার সাহায্যে রোগ-বালাই সারিয়ে তুলতে পারলে, আপনি কেন পারবেন না! ব্যাপারটা চ্যালেঞ্জ বা তর্ক নয়, কারণ পারা যে যায় সেটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়েছে। সাধু-সন্ন্যাসী বা অন্যান্যদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা ব্যবহারে ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে, কারণ এই ক্ষমতা অর্জন এবং ব্যবহার সম্পর্কে তাঁদের কোনো রকমের ট্রেনিং নেয়ার সুযোগ হয়নি। বোধহয় সেজন্যেই অভিযোগ শোনা যায়, অমুক লোককে ফকির বাবাজী চিকিৎসা করেছিল, কিন্তু রোগটা আরো বেড়ে গেল। এঁদের প্রতি কিছু লোকের যেমন ভক্তি আছে, তেমনি কিছু লোকের রয়েছে চরম অবিশ্বাস। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে না জানার ফলে বা অপব্যবহার করায় ফলাফল সব সময় সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারে না, সেটাই এই অবিশ্বাসের কারণ।

আপনি পদ্ধতি এবং কৌশল শিখে রীতিমত চর্চার পর রোগ সারাবার কাজে হাত দেবেন, কাজে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই। এই সব পদ্ধতি এবং কৌশল সাধারণ মানুষের অলস মস্তিষ্ক থেকে আসেনি, এসেছে নিবেদিত প্রাণ গবেষকদের দীর্ঘকাল গবেষণার ফসল হিসেবে। এগুলোকে সঠিক এবং ত্রুটিহীন মনে না করার কোনো কারণ নেই।

একটা বিষয় পরিষ্কার, মনকে কোথাও বা কারো ভেতর ঢোকাবার ব্যাপারে এনার্জি বা শক্তির একটা ভূমিকা আছে। এই শক্তি চালিত হয় আমাদের মনের অভিপ্রায় বা সংকল্পের দ্বারা। মনের এই সংকল্প যদি বদলে দেয়া যায়, তাহলে শক্তির গতিবিধি এবং অর্জনও বদলে যাবে। মনের সংকল্প যদি তথ্য পাওয়া হয়, শক্তি তখন সেটা সংগ্রহের জন্যে ছোটে। সেই রকম, মনের সংকল্প যদি রোগ-বালাই সারিয়ে তোলা হয়, শক্তিও তখন সেই কাজ সম্পাদন করার জন্যে উঠেপড়ে লাগে।

এখন কিভাবে এই শক্তির গলায় একটা লাগাম পরানো যায়, যাতে আপনি যা চান তাই করিয়ে নেয়া যায় তাকে দিয়ে? সংকল্প একা, অনেকটা ইচ্ছাশক্তির মতো। একা

শুধু ইচ্ছাশক্তিকে কোনো কাজে লাগিয়ে তেমন কোনো ফল পাওয়া যায় না। সেই রকম, শুধু সংকল্প দিয়ে কাজ হবে না। এর সাথে যোগ হওয়া চাই মনের পর্দায় চাক্ষুষ করা। মনের পর্দায় শুধু দেখে আপনি যেমন অসুস্থতা চিহ্নিত করতে পারেন, তেমনি ভাবে আপনি ওগুলোকে যে অবস্থায় দেখতে চান সেভাবে দেখবেন—সুস্থ অবস্থায়। এরই নাম সাইকিক হিলিং বা অতীন্দ্রিয় পদ্ধতিতে রোগ-নিরাময়। ব্যাপারটা এই রকমই সহজ, এর মধ্যে আর কোনো জটিলতা নেই।

বেশিরভাগ অসুস্থতা যেগুলো আপনি সারিয়ে তুলতে চাইবেন, তার জন্যে ল্যাবরেটরী পদ্ধতি বা কেস নিয়ে কাজ করার পদ্ধতি শিখে আগে ওস্তাদ হয়ে ওঠার কোনো দরকার নেই। সমস্যা দূর করার জন্যে এর আগে আপনি মনের পর্দা ব্যবহার করেছেন, শুধু সেটা ব্যবহার করেও আপনি একজন সফল অতীন্দ্রিয় রোগ-নিরাময়কারী হতে পারেন। আরো একটা অতি সহজ পদ্ধতি আছে, ইচ্ছে করলে সেটাও ব্যবহার করতে পারবেন। সেটা সম্পর্কে এই পরিচ্ছেদের শেষে বলবো আমরা। আসলে, আপনি যখন ধ্যান করা শেখা আর মনের পর্দায় ছবি দেখা শেখার প্রথম দিকে থাকবেন, তখনও অসুস্থতা সারানোর ক্ষেত্রে কিছু কিছু সফলতা দেখতে পাবেন।

জীবনের অনেক সম্ভাবনাই একটা বিপজ্জনক, অনিশ্চিত কিনারায় ভারসাম্য বজায় রেখে ঝুলছে। সামান্য একটু ধাক্কা দিয়ে পাকা ফলের মতো সম্ভাবনাটাকে নিজের দিকে ফেলতে পারেন আপনি। আবার কপাল খারাপ হলে এমনও হতে দেখা যায় যে ধাক্কাটা আগেই পড়েছে, কিন্তু উল্টো দিকে। ওটাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হলে আপনাকে অর্জন করতে হবে আরো অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা। মন-নিয়ন্ত্রণ করতে যতোটা দক্ষতা অর্জন করতে চান ততোটা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত যদি সাইকিক হিলিং শুরু করতে দ্বিধা থাকে, তাহলে শুধু অমূল্য সময়েরই অপচয় করা হবে। অনেকের অনেক সাহায্য দরকার,আপনি সাহায্য করতেও পারেন, তবু অপেক্ষা করবেন কেন?

এবার কিভাবে রোগ সারাতে হবে তার নিয়ম, ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করা হলো।

১। যার চিকিৎসা আপনি করতে চান, তার অবস্থা জানতে পারলে সুবিধে হয়, তবে জানতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। এটা আপনি অতীন্দ্রিয় উপায়েও জানতে পারেন, আবার বিটা লেভেলে থেকে অর্থাৎ জেগে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন উপায়ে জানতে পারেন।

২। নিজের ধ্যানের লেভেলে চলে যান, তারপর লোকটা যেমন তাকে ঠিক সেভাবে আপনার মনের পর্দায় নিয়ে আসুন, তার অসুস্থতা সহ। এরপর পর্দার বাঁ দিকে অন্য একটা ছবি আনুন, ওই লোকেরই, তবে এই ছবিতে আপনি দেখবেন তার অসুস্থতার জন্যে কিছু একটা নিরাময় ব্যবস্থা করা হয়েছে। (আপনি যদি লোকটার সাথে পরিচিত না হয়ে থাকেন, এবং যদি কেস নিয়ে কাজ করার জন্যে এখনো তৈরি না হয়ে থাকেন, তাহলে আগেই আপনাকে জেনে নিতে হবে লোকটা দেখতে কেমন, তা না হলে মনের পর্দায় তার ছবি পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাবেন না।)

৩। এবার পর্দায় আনুন, আরো বাঁ দিকে, লোকটার সম্পূর্ণ সুস্থদেহের ছবি। আপনাকে দেখতে পেতে হবে, লোকটা প্রাণ চাঞ্চল্যে এবং আশাবাদে ভরপুর হয়ে আছে। গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় নিজেকে বলা যে-কোনো কথা প্রচণ্ড ছাপ ফেলে মনে,

কারণ তখন আপনার গ্রহণ ক্ষমতা সাংঘাতিক বেড়ে যায়। এই মুহূর্তটি আপনার জন্যে অত্যন্ত কঠিন। কারণ লোকটার অসুস্থতা যাই হোক, যতো গুরুতরই হোক, সে-কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস আনতে হবে, মনের পর্দায় লোকটার যে সুস্থদেহের ছবি দেখছেন আপনি, সেটাই একমাত্র সত্যি—ব্যাপারটা সত্যি হয়ে উঠছে বা সত্যি হয়ে উঠবে নয়, এখনই সত্যি। এর কারণ হলো, ধ্যানমগ্নতার এই স্তরে, আলফা আর থিটায়, আপনার মন যুক্তি, হেতু, আর কারণের সাথে যুক্ত রয়েছে—বিটা লেভেলে আপনার মন বেশিরভাগ যুক্ত থাকে ফলাফলের সাথে। আলফা আর থিটায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পর্দায় ছবি দেখে আপনি আসলে যুক্তি, কারণ আর হেতু তৈরি করেছেন। যা হয়নি সেটাকে সংঘটিত হয়েছে ধরে নেয়ায়, আপনার হয়ত মনে হতে পারে, সময়ের স্বাভাবিক গতি বা নিয়ম লঙঘন করা হলো। এই চিন্তাটাকে কোনো গুরুত্ব দেবেন না। এই লেভেলে সময় অন্য খাতে বয়। মনের পর্দায় চাক্ষুষ করুন যে ফলাফল আপনি চান সেটা ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে।

নিশ্চয় করে বলা যায়, বিধাতার তৈরি শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত আছে একটা মহাজাগতিক মানবাধিকার সনদ, যাতে গ্যারান্টি দিয়ে বলা হয়েছে, আমরা সবাই, ছোটো হই বড় হই, বোকা হই বা বুদ্ধিমান, দৃঢ় বাসনা, বিশ্বাস আর প্রত্যাশার মাধ্যমে মঙ্গলসূচক ঘটনা ঘটাবার কারণ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করতে পারবো। এই কথা আগেও বলা হয়েছে, আরো ভালো ভাবে, প্রায় দু'হাজার বছর আগেঃ 'যে জিনিস তুমি কামনা করো, প্রার্থনার সময়, বিশ্বাস করো তা তুমি পাবে, এবং তা তুমি পাবে।'—নিউ টেস্টামেন্ট।

লোকটাকে যখন মনের পর্দায় সুস্থ দেহে দেখছেন আপনি, এই সময় একটা মুহূর্ত আসবে, অত্যন্ত আনন্দময় মুহূর্ত হবে সেটা, তখন আপনি উপলব্ধি করবেন যা করার যথেষ্টই করেছেন। মুহূর্তটি আনন্দদায়ক হবে এই জন্যে যে ওটা আপনার সাফল্যের মুহূর্ত। এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুণে এবার উঠে আসুন বিটায়, অনুভব করুন সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় জেগে আছেন, এবং আগের চেয়ে তাজা আর ঝরঝরে লাগছে।

এই পদ্ধতি যতোই ব্যবহার করবেন, ততোই চমৎকার সব 'কাকতালীয়' ঘটনা ঘটবে, ততোই দৃঢ় হবে আপনার বিশ্বাস, যা এমনকি আরো চমৎকার কাকতালীয় ঘটনা প্রসব করবে। আপনি আপনার মনের পর্দা ব্যবহার করা শিখতে যা দেরি, তারপর থেকেই চেইন রিয়্যাকশনের মতো একের পর এক এই ঘটনা ঘটতে থাকবে।

সাইকিক আর ফেইথ হিলিঙের টেকনিক আলাদা বটে, কিন্তু দুটোরই মূল নীতি আর ফলাফল এক। ফেইথ হিলিঙের রীতি-নীতি এক এক ধর্মে এক এক রকম, কিন্তু মূল শর্ত মাত্র দুটোই—এক, পৌঁছুতে হবে মনের গহনে। দুই, থাকতে হবে বাসনা, বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা।

চোদ্দ

আরো কিছু চিন্তা-ভাবনা

সবার জীবনেই সমস্যা আছে। সমস্যা যেমন আছে তেমনি তার সমাধানের রাস্তাও খোলা আছে। এই বই পড়ে আপনি আরো কিছু রাস্তা খুললেন, যেগুলো ব্যবহার করে আপনার অনেক সমস্যার সমাধান বের করতে পারবেন। এই বইয়ের এক থেকে বারো নম্বর পরিচ্ছেদের লক্ষ্য হলো, নিজের এবং অন্যান্যদের সমস্যা সমাধানে আপনার মনকে বিশেষ ভঙ্গিতে ব্যবহার করা শেখানো। আপনি এই বইতে যা পড়লেন তা একা কোনো এক ব্যক্তির গবেষণার ফসল নয়। অনেক পণ্ডিত কঠোর পরিশ্রম করে যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন তারই নির্যাস এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, এই বইয়ে এমন অনেক জিনিসও আপনি পড়েছেন যা একজন গবেষকের ত্রিশ বছর একটানা পড়াশোনা এবং কঠোর সাধনার ফসল।

যুগের সাথে সাথে দর্শন এবং বিশ্বাস পাল্টে যায়। মানুষ, মানুষের অস্তিত্ব, তার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে নতুন নতুন ধারণার জন্ম হচ্ছে। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, আমরা যারা এই পৃথিবীতে বসবাস করছি তাদের উন্নতির সম্ভাবনা ধীরে ধীরে কমে আসছে এবং খুব তাড়াতাড়ি এমন একটা সময় আসছে যখন আর উন্নতি করার কোনো উপায়ই থাকবে না, যদি উন্নতি করার নতুন কোনো পদ্ধতি আমরা খুঁজে বের না করতে পারি। এসব বিষয়ে এবং অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা সম্পর্কে মহাজনেরা কি ভাবনা-চিন্তা করছেন তাই নিয়ে আলোচনা করবো এই পরিচ্ছেদে।

মন-নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তাঁদের কাছে সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য বলে মনে হয়েছে, সেটা হচ্ছেঃ এই বিদ্যার সাথে ধর্মের কোনো বিরোধ নেই। এঁরা যা উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করেছেন তার সাথে শুধু ধর্মের নয়, বিশ্বজনীন আবেদন আছে এমন কোনো দর্শন বা বিশ্বাসেরও কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। বোধহয় সেজন্যেই বিদ্যাটা শেখার জন্যে হিন্দু-মুসলমান, খ্রীস্টান-বৌদ্ধ সহ প্রায় সব ধর্মের লোকের মধ্যেই আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

এর মানে কি তবে এই যে যে-সব টেকনিক উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলো খারাপও নয় ভালোও নয়—মালটিপ্লিকেশন টেবিলের মতো? এসব প্রসঙ্গে পণ্ডিত ব্যক্তিদের কিছু দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সেগুলো এখানে আমরা প্রশ্নোত্তরের আকারে পরিবেশন করবো। এ থেকে অনেক কিছুই হয়তো আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। অন্তত এসব যে আপনাকে চিন্তার খোরাক যোগাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

১। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কি আইন আছে?—অবশ্যই, বিজ্ঞান সেগুলো আবিষ্কার করছে।

২। এই আইন কি আমরা ভাঙতে পারি?—না। পাহাড়ের ওপর থেকে লাফ দিলে আমরা মারা পড়বো, কিংবা আহত হবো। আইন ভাঙে না—ভেঙে যাই আমরা।

৩। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কি নিজের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে?—আমরা জানি অন্তত তার একটা অংশ পারে—আমরা। তাহলে কি এটা ধরে নেয়া অসঙ্গত হবে যে গোটা ব্রহ্মাণ্ডই তা পারে?

৪। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কি আমাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত?—তা কিভাবে সম্ভব। আমরা তো তারই একটা অংশ, এবং সে আমাদেরকে প্রভাবিতও করে।

৫। আমরা মূলত ভালো না মন্দ?—আমরা যখন নিজেদের সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি—ধ্যানমগ্ন অবস্থায়—ভালো ছাড়া কারো কোনো ক্ষতি করার শক্তি আমাদের থাকে না।

বাস্তবতার অনেক সংজ্ঞা আছে। তার মধ্যে একটা, বাস্তবতা হলো একটা স্বপ্ন যা আমরা সবাই দেখছি। বাস্তবতা আসলে কি, এ-সম্পর্কে আমাদের ধারণা একেবারেই অস্পষ্ট। আমরা যা উপলব্ধি করি, যে ভাবে দেখি, বেশিরভাগই নিজেদের সুবিধে মতো। দূরের কোনো জিনিস আসলেই ছোটো নয়, এবং নিরেট কোনো জিনিসই আসলে নিরেট নয়।

সব কিছুই এনার্জি। একটা রঙ আর একটা শব্দের সাথে, কসমিক রে. আর টি. ভি. র ছবির সাথে পার্থক্য হলো ফ্রিকোয়েন্সি—কিংবা এনার্জি কি করছে এবং কতো দ্রুত করছে।

এনার্জি সম্পর্কে একটা মজার ব্যাপার হলো, বৈপরীত্যের এই জগতে—উঁচু-নিচু, সাদা-কালো, দ্রুত-মন্থর—এনার্জির উল্টো কিছু নেই। এর কারণ, জগতে এমন কিছু নেই যা এনার্জি নয়। আমি আপনি সহ সবকিছু, এবং আমরা যা চিন্তা করি তাও, সমস্তই এনার্জি। চিন্তা করতে গেলেও এনার্জি লাগে। চিন্তা এনার্জি খরচও করে, আবার তৈরিও করে।

এবার বোধহয় আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোনো কোনো পণ্ডিত চিন্তা আর বস্তুর মধ্যে কেন মাত্র অল্প একটু পার্থক্য দেখতে পান।

চিন্তা কি বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে?—কেন পারবে না, এনার্জি তো পারে।

চিন্তা কি ঘটনাকে প্রভাবিত করতে পারে?—কেন পারবে না, এনার্জি তো পারে।

সময় কি এনার্জি?—এর উত্তর দেয়া কঠিন, কারণ সময় একটা নয়, অনেকগুলো মুখ নিয়ে রয়েছে আমাদের সামনে। এক দিক থেকে তার পানে তাকান, আপনার মনে হবে ওটাকে আপনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন, তারপর আরেক দিক থেকে তাকান, মনে হবে এ তো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

সময় সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই, একে আমরা ভাগ করে নিয়েছি নিজেদের সুবিধে মতো। এই ভাগ যদি না করা হতো, দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকাই দায় হয়ে উঠতো আমাদের। আমরা ধরে নিয়েছি সময় একটা সরলরেখা ধরে ছুটছে, অতীত থেকে শুরু করে, বর্তমান হয়ে, ভবিষ্যতের দিকে। সময়কে এই ভঙ্গিতে

ভাগ করে নিয়ে চিন্তা করলে যা ঘটে গেছে সেগুলোকে অতীত বলে চিহ্নিত করতে পারি, উপলব্ধি করতে পারি বর্তমানকে, এবং বুঝতে পারি এরপর যা ঘটবে তা ভবিষ্যতের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে।

কিন্তু অন্য পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপারটা তা নয়। আলফা এবং থিটায় আমরা শুধু অতীতকে দেখতে পাই না, দেখতে পাই ভবিষ্যৎকেও। যে ঘটনা ঘটেনি কিন্তু ঘটবে তার ছায়া পড়ে আগেই, ট্রেনিং নেয়া থাকলে সে ছায়া আমরা দেখতে পাবো।

আলফা আর থিটা থেকে ভবিষ্যৎকে যদি এখানে এখনই দেখতে পাওয়া যায়, তারমানে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই কোনো এক ধরনের এনার্জি সামনের দিকে পাঠাচ্ছে, যার আঁচ আমরা ওই লেভেলগুলোয় থাকলে পাই। ভবিষ্যৎ সময়ের একটা রূপ, সে যদি কোথাও কোনো রকম এনার্জি পাঠায়, তাহলে নিশ্চয়ই সময় নিজেই একটা এনার্জি।

এবার হাইয়ার ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে দুটো কথা। গবেষকরা হাইয়ার ইন্টেলিজেন্স বলতে কি সৃষ্টিকর্তাকে বোঝাতে চেয়েছেন?—এই প্রশ্নের উত্তর তাঁরা যুক্তি দিয়ে নয়, দিয়েছেন বিশ্বাস থেকে। এবং তাঁরা স্বীকার করেছেন, তাঁদের এই বক্তব্য তাঁরা প্রমাণ করতে পারবেন না।

উত্তর হলো—না, হাইয়ার ইন্টেলিজেন্স বলতে তাঁরা সৃষ্টিকর্তাকে বোঝাতে চাননি। জিনিসটার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁরা নিঃসন্দেহ, কিন্তু পরিচয় সম্পর্কে অতোটা নয়। তবে সৃষ্টিকর্তা যে নয় সে-ব্যাপারে তাঁরা সবাই একমত। অনেক পণ্ডিত ইন্টেলিজেন্সের বিভিন্ন স্তরকে অবিচ্ছিন্ন একটা ধারা বলে মনে করেন—শুরু হয়েছে জড় বস্তু থেকে, তারপর উদ্ভিদ, তারপর প্রাণী, তারপর মানুষ, তারপর হায়ার ইন্টেলিজেন্স এবং শেষ হয়েছে সৃষ্টিকর্তায়। তাঁদের ধারণা, প্রতিটি লেভেলের সাথে, জড় পদার্থ থেকে শুরু করে হাইয়ার ইন্টেলিজেন্স পর্যন্ত, বিজ্ঞান ভিত্তিক যোগাযোগ করার উপায় নিশ্চয়ই আছে।

আমাদের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আমরা মানুষরা ক্রমবিকাশের একটা পর্যায় অতি সম্প্রতি শেষ করেছি। ওটা ছিলো আমাদের ব্রেনকে উন্নত করার প্রয়াস। এই কাজে আমরা সফল হয়েছি, অর্থাৎ কাজটা শেষ হয়েছে—যতোগুলো ব্রেন সেল আমাদের পাবার ছিলো তার সবগুলোই আমরা পেয়ে গেছি। এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে পরবর্তী পর্যায়ের কাজ—আর তা হলো, আমাদের মনের উন্নয়ন। এখন যেটাকে বিশেষ অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, অচিরেই আমরা সবাই সেই ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবো। এর জনপ্রিয়তা এবং প্রসার ঠেকিয়ে রাখার কোনো উপায় নেই।

ব্যাস, এই পর্যন্তই। বই শেষ করবার আগে আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনার সাথে সময়টা আমার চমৎকার কেটেছে।

ঃ সমাপ্ত ঃ